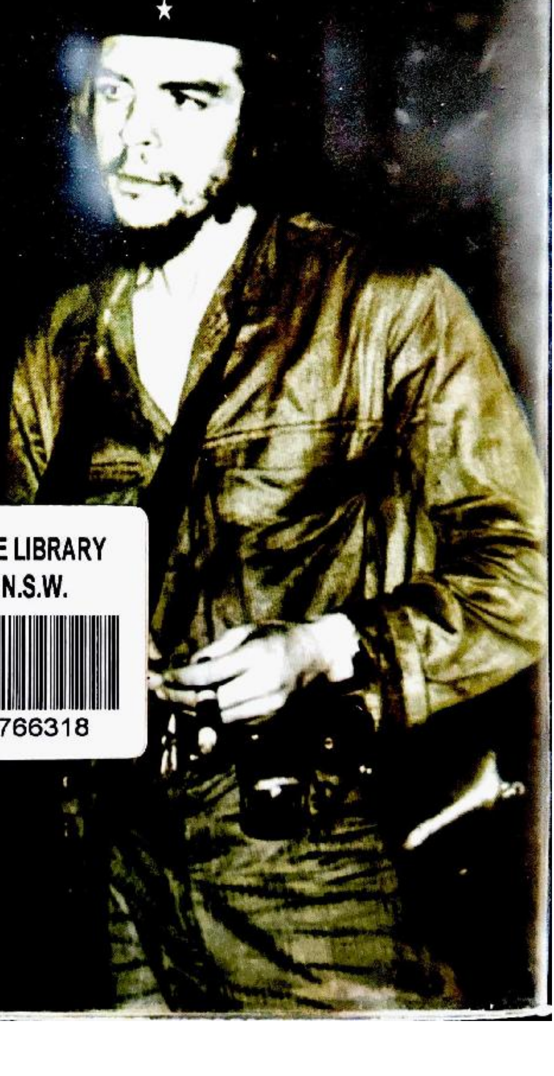
গেরিলা যুদ্ধ

চে গেভারা



অনুবাদ : অশেষ রায়

চে গেভারা

গেরিলা যুদ্ধ



মুল স্প্যানিশ থেকে অনুবাদ

অশেষ রায়

র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা

Guerra de Guerillas
[GUERRILLA WARFARE
With Corrections Made by
Ernesto 'Che' Guevara)]
Translator : Asesh Roy

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১২

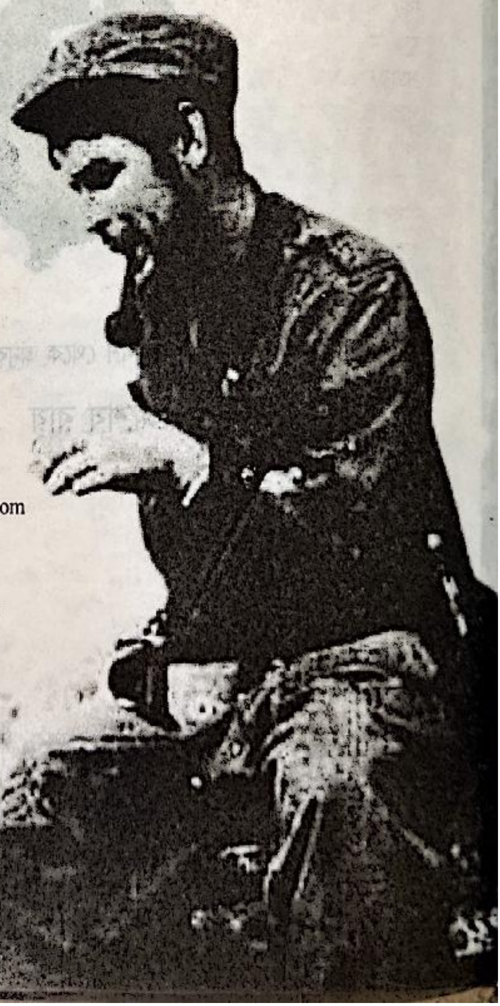
অক্ষর বিন্যাস : সুব্রত সাহা

মুদ্রক :
ডি. এ্যান্ড পি. গ্রাফিক্স প্রা. লি.
গঙ্গানগর, কলকাতা-১৩২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অমিতাভ রায়

প্রকাশক :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১ ৬৯৮৮
ই-মেল : radimp60@yahoo.com

ISBN : 978-81-85459-48-6



অনুবাদকের কথা

ঐতিহাসিকভাবে 'গেরিলা যুদ্ধ' এই অভিব্যক্তিটির উৎপত্তি স্পেনীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, যখন স্পেন পদানত ছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ফরাসী বাহিনীর দ্বারা। মাদ্রিদে ২রা মে, ১৮০৮ ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল অগণিত স্বাধীনতাকামী জনগণ। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চলে স্পেনীয় জনগণের প্রতিরোধ, মূলত guerra de guerillas-এর মাধ্যমে;আর পরে বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে গুপ্ত আক্রমণ, অন্তর্ঘাত, শত্রুকে হতচকিত করার মাধ্যমে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত অনিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সামরিক কৌশলের নাম দেওয়া হল 'গেরিলা যুদ্ধ' (guerra de guerillas)।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিপীড়িত জনগণের একটা মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় এই গেরিলা যুদ্ধ, যখন শাসকদের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সম্মুখসমর এককথায় অসম্ভব। তবে যেহেতু সন্ত্রাসবাদ আর গেরিলা যুদ্ধ সমার্থক নয়, তাই রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে, গেরিলা যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ বিফলে যাবে। গেরিলা যোদ্ধাদের সংখ্যা অল্প হতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে নাড়ীর যোগ থাকতে হবে দেশের শ্রমিক-কৃষকদের। যেহেতু প্রাথমিকভাবে গেরিলা লড়াইটা শুরু হয় পাহাড়-জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে, তাই ঐ অঞ্চলের কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ একান্তই প্রয়োজন। মাও সে তুঙ-এর কথায়, 'কৃষকরা হল সমুদ্র, যার মধ্যে গেরিলাদের সাঁতার কাটতে হয়।' তিনি আরও বলছেন—'কৃষকদের নিয়মিত এবং সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।' তাই গেরিলা বাহিনীর রাজনৈতিক কার্যক্রম জনগণের আশা-আকাঙ্খার অনুসারী হওয়া উচিত।

বিভিন্ন দেশের বিশেষ পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জনগণের শ্রেণীবিভাগ—এই সবের উপর নির্ভর করে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল। চীনের মুক্তিযুদ্ধে সে দেশের প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ Sun Tzu (খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী)-এর ধারণার সফল প্রয়োগ করেছেন মাও সে তুঙ, অবশ্যই চীনের বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে। আবার বিগত শতাব্দীর অন্যতম সফল গেরিলা যুদ্ধের রূপকার কিউবার জনগণ—ফিদেল কাস্ত্রো, চে গেভারা এবং আরও অগণিত বীরসেনানী। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে দিতে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে চে লিখেছেন অসামান্য দলিলস্বরূপ এই গ্রন্থ—যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত গেরিলাবাহিনীর কাছে একথায় এক handbook। কিউবার বিশেষ অবস্থা সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও, গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, রণনীতি, সংগঠন, প্রচার এবং আরও সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধার বিশ্লেষণ প্রতিটি গেরিলা যোদ্ধা এবং গেরিলাবাহিনীর কাছে চিরকাল আদৃত হবে।

স্পেনীয় ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থটির প্রতি আদ্যন্ত বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি; কিছু বিশেষক্ষেত্রে পরিভাষা প্রয়োগে আমার অক্ষমতার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

জানুয়ারি ২০১২

সূচি



উৎসর্গ

কামিলোকে

এই লেখাটি উৎসর্গ করা হল কামিলো সিয়েনফুয়েগোসকে, যার উচিত ছিল এটিকে পড়া এবং সংশোধন করা। কিন্তু তার নিয়তি এই কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল।* এই পঙক্তিগুলি এবং পরবর্তীকালে যা লেখা হয়েছে তা বিদ্রোহী বাহিনীর এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে; সেই মহান গেরিলা প্রধান, এক অসাধারণ বিপ্লবী এবং ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, যাকে তৈরি করেছে বিপ্লব।

অনেক, অনেক যুদ্ধে কামিলো ছিল আমাদের বন্ধু, যুদ্ধের বিপদসংকুল মুহূর্তে ফিদেলের অন্তরঙ্গ প্রাণের বন্ধু, এক আত্মসংযমী যোদ্ধা যে ইস্পাত কঠিন চরিত্র নিয়ে সর্বদাই আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকত বাহিনীর মনোবলকে উর্দ্ধে তুলে ধরার জন্য।

আমার বিশ্বাস সে আমাদের গেরিলা জীবনের অভিজ্ঞতাকে একীভূত করার এই প্রচেষ্টাকে অনুমোদন করত, কারণ এটা জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এর মধ্যে যা বিধৃত হয়েছে তার সঙ্গে সে সংযোজন করতে পারত তার অদম্য মানসিক শক্তি, তার বুদ্ধিমত্তা আর তার দুঃসাহসিকতা, যা ইতিহাসে খুব অল্প লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু কামিলোকে ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রেরণায় অলৌকিক কার্যকলাপ করে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন যোদ্ধা হিসাবে মনে করলে ভুল করা হবে। বরং সে ছিল জনগণের দ্বারা নির্মিত এক সত্যিকারের নেতা ; কারণ বীর, শহীদ আর নেতারা উঠে আসেন সংগ্রামের জরুরী প্রয়োজনে।

জানি না, বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে দান্তনের তত্ত্বকথাটি কামিলো জানতো কি না, "দুঃসাহস, দুঃসাহস এবং আরও দুঃসাহস।" কিন্তু সে তার কার্যাবলীর মধ্যে সেটি অনুশীলন করত আর গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে আরও কিছু আবশ্যকীয় গুণাবলীও সংযোজন করত : পরিস্থিতির দ্রুত এবং সঠিক মূল্যায়ণ এবং ভবিষ্যতের সমস্যার আগাম অনুধাবন করার ক্ষমতা।

যদিও এই পঙক্তিগুলিকে ধরে নেওয়া যায় লেখক এবং জনগণের আমাদের বীরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে, তবুও এটিকে জীবনী বলা ঠিক হবে না, এবং তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার প্রচেষ্টাও নয় এটা। কামিলোর জীবনে শত সহস্র গল্প : যেখানেই সে গেছে, গল্প সৃষ্টি হয়েছে তখনই। তার সহজ সরল ব্যবহারে আকৃষ্ট হত জনসাধারণ। এর সঙ্গে ছিল তার ব্যক্তিত্ব যা স্বভাবতই এবং অজ্ঞাতসারে প্রভাব ফেলত তার চারপাশে সব কিছুর উপর। খুব অল্প লোকই যা কিছু করে তার উপর তার স্বকীয়তার ছাপ রাখতে পারে এইভাবে। ফিদেল যেমন বলত, তার সংস্কৃতি পুঁথিগত ছিল না ; জনগণের স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তা ছিল তার। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে থেকে জনগণ তাকেই নেতা নির্বাচিত করেছিল তার আঘাত করার দুঃসাহস, তার জেদী মনোভাব, তার বুদ্ধিমত্তা আর অননুকরণীয় নিষ্ঠার জন্য।

---

* কামিলো সিয়েনফুয়েগোস ছিলেন কিউবার বিপ্লবী যুদ্ধে আনতোনিও মাসেও, দু'নম্বর কলামের কম্যান্ডার। ১৯৫৯-এর অক্টোবরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।

কামিলোর আনুগত্য ছিল ধর্মের সমতুল। ফিদেলের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যে সে ছিল নিবেদিত প্রাণ, কারণ ফিদেল জনগণের আকাঙ্খাকে মূর্ত করে তুলেছিল। আর অন্যদিকে ছিল জনগণের প্রতি আনুগত্য। ফিদেল এবং জনগণ চলার পথে ছিল এক ও অভিন্ন, এই দুর্জয় গেরিলা যোদ্ধার নিষ্ঠা ছিল তার সাথী।

কে তাকে খুন করল?

প্রশ্নটাকে এইভাবেও রাখা যায় : কে তার দেহটাকে ধ্বংস করল? কারণ তার মত মানুষ জনগণের সঙ্গেই বাঁচে, যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন সে-ও থাকবে তাদের হৃদয়ে।

শত্রুরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ তারা তাকে মৃত দেখতে চেয়েছিল। তারা হত্যা করেছিল কারণ কোন নিরাপদ বিমান ছিল না আর বিমানচালকরাও সমস্ত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লব্ধ করতে পারেনি। কারণ, অত্যাধিক কাজের চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে কামিলো হাভানায় দ্রুত ফিরতে চেয়েছিল। তার নিজের চরিত্রই তাকে হত্যা করেছিল। বিপদকে কখনও গুরুত্ব দিত না কামিলো। তার গতিপথ পরিবর্তন করতেই অভ্যস্ত ছিল সে। বিপদকে সে ঠাট্টা করত, প্রলুব্ধ করত অথবা বলা যায় খেলা করত। আকাশে কালো মেঘ দেখে কখনও সে কোনও পরিকল্পনা স্থগিত রাখেনি বিপ্লবী যোদ্ধার ঐতিহ্য অনুসরণ করে।

সেই মুহূর্তে সমগ্র জনগণ তার কথা শুনেছে, শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছে এবং তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। ঘটনাটা আগেও ঘটতে পারত, আর তাহলে একজন গেরিলা অধিনায়কের মতই হত তার সাদামাটা কাহিনী। "আরও অনেক কামিলো আবির্ভূত হবে", বলেছে ফিদেল। আমি সেই কথাতে আরও একটু যোগ করি, আরও অনেক কামিলোর অস্তিত্ব ছিল, যাদের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে কামিলোর ইতিহাস গড়ার মুহূর্তের আগেই। কামিলো এবং অন্যান্য কামিলোরাই (যারা কামিলো হয়ে উঠতে পারেনি এবং যারা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে) হচ্ছে জনগণের ক্ষমতার দ্যোতক।

বিশুদ্ধ আদর্শের সাথে মহৎ উদ্দেশ্য আহরণের জন্য বিশ্বাসের সঙ্গে যে যুদ্ধ লড়া হয়, তার জন্য তারাই হচ্ছে জাতির সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি।

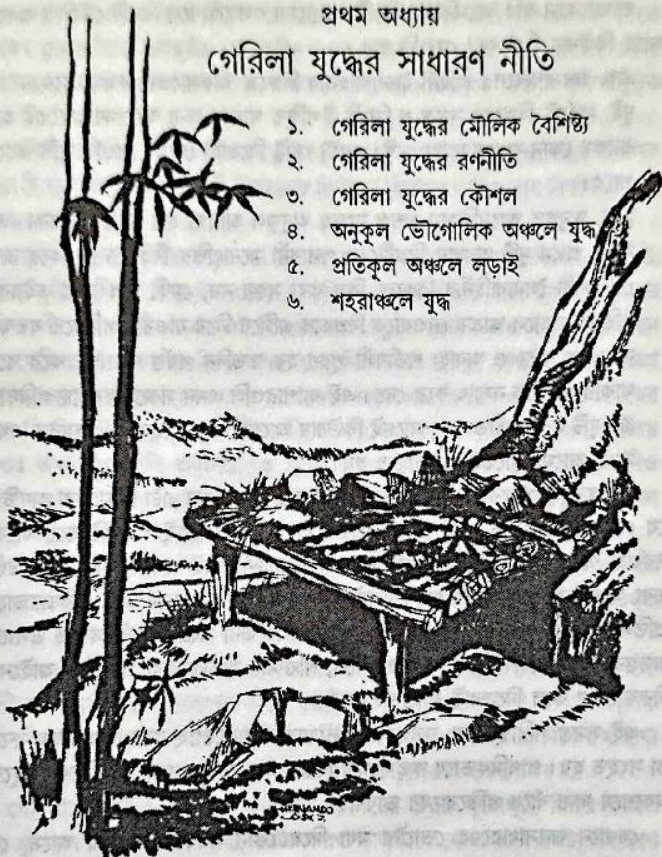
কোনও ছাঁচে ফেলে আমরা তাকে বিচার করব না—অন্য কথায় বলতে গেলে তাকে হত্যা করব না। একটা সাধারণ রূপরেখার ভিতরে থাকতে দেব তাকে, তার ওপর কোন নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক মতবাদ চাপিয়ে দেবারও চেষ্টা করব না, কারণ এর কোন সংজ্ঞা তখনও নিরূপিত হয় নি। এ কথাটারই পুনরুক্তি করব যে, এই মুক্তিযুদ্ধে কামিলোর মত আর কোন যোদ্ধা ছিল না—এক পরিপূর্ণ বিপ্লবী, জনগণের প্রতি নিবেদিত প্রাণ, এই বিপ্লবের অন্তস্থল থেকে কিউবান জাতির সৃষ্ট এক প্রতিনিধি। ক্লান্তি অথবা উদ্যমহীনতার বিন্দুমাত্র ছায়াও রেখাপাত করেনি তার মস্তিষ্কে। গেরিলা যোদ্ধা কামিলো যা কিছু করত তার ভিতরেই থাকত তার স্বকীয়তা, তার নির্দিষ্ট এবং অনপনেয় ছাপ রেখে গিয়েছে কিউবা বিপ্লবে ; সে ছিল স্থায়ী এবং দৈনন্দিন প্রেরণার উৎস। অতীত এবং ভবিষ্যতের সব কামিলোদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল তার।

নিরবচ্ছিন্ন ও অবিনশ্বর পৌনঃপুনিকতায় কামিলো হচ্ছে জনগণের হৃদয়ের প্রতিফলন।

এরনেস্তো চে গেভারা

প্রথম অধ্যায়

গেরিলা যুদ্ধের সাধারণ নীতি



১. গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিউবান জনগণের সশস্ত্র জয়লাভকে যেভাবে কেবল বীরোচিত সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া হয়, সেটাই সব না, এই জয়লাভ লাতিন আমেরিকার সাধারণ জনগণের চরিত্র সম্পর্কে পুরানো আপ্ত বাক্যকেও বদলে দিয়েছিল। পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছিল গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এক নিপীড়নমূলক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজেদের মুক্ত করায় জনগণের অদম্য পারদর্শিতা।

আমরা মনে করি আমেরিকার বিপ্লবী সংগ্রামের কলাকৌশলে তিনটি মৌলিক অবদান আছে কিউবান বিপ্লবের। সেগুলি হল :

এক. জনসাধারণের বাহিনী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভের ক্ষমতা ধরে।

দুই. সর্বত্রই বিপ্লবের সমস্ত শর্তাবলী উপস্থিত থাকার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একটা ছোট্ট বিদ্রোহী গোষ্ঠী সেগুলি সৃষ্টি করতে পারে।

তিন. অনুন্নত আমেরিকায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুকূল জায়গা হল গ্রামীণ এলাকা। এর মধ্যে প্রথম দুটি অবদান বিপ্লবীদের পলায়নী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করে এবং পেশাদারী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়, মেকী বিপ্লবীদের এইরকম যুক্তির আড়ালে আশ্রয় নেওয়াকে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যতক্ষণ না সমস্ত বাহ্য ও অবাহ্য শর্তাবলী পূরণ হয় ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকার যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়। এই ব্যাপারগুলি এখন সকলের কাছে পরিষ্কার এই দুটি সন্দেহাতীত সত্য আগেই কিউবায় আলোচিত হয়েছিল এবং সম্ভবত এখন সমগ্র আমেরিকাতেই আলোচিত হয়।

স্বভাবতই বিপ্লবের পরিস্থিতি নিয়ে যখন কথা হয়, তখন এটা চিন্তা করা অনুচিত যে গেরিলাদের একটি ছোট্ট দলের প্রেরণা বা আবেগ থেকেই তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সর্বদাই এটা বুঝতে হবে যে একটা ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাই প্রথম গোষ্ঠীটির প্রতিষ্ঠা এবং সংহতির পক্ষে অপরিহার্য। বলাই বাহুল্য জনগণের সামনে এটা পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন করতে হবে যে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম আইনসম্মত উপায়ে অসম্ভব। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, শক্তিমান অত্যাচারীরা প্রতিষ্ঠিত আইনের বিরুদ্ধাচারণ করে নিজেরাই শান্তিভঙ্গ করে।

এই সমস্ত পরিস্থিতিতে, জনগণের অসন্তোষ রূপ পরিগ্রহ করে এবং ক্রমে ক্রমে তা সংহত হয়। প্রাথমিকভাবে কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের জন্য এক বিশেষ মুহূর্তে অবশেষে দানা বাঁধে প্রতিরোধের ভাবনা।

যেখানে জনসাধারণের ভোটের মধ্য দিয়ে কোন সরকার ক্ষমতায় আসে, সে সৎপথেই হোক অথবা জাল জোচ্চুরি করেই হোক, এবং একটা আপাত সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার বাতাবরণ তৈরি করে, সেখানে গেরিলা অভিযান বেশ কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা তখনও নাগরিক আন্দোলনের সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হয়ে যায় না।

তিন নম্বর সিদ্ধান্তটি মৌলিকভাবে কৌশলগত। যে সমস্ত লোক গোঁড়াভাবে বিশ্বাস করেন যে, সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুটি থাকা উচিত শহরের জনগণের আন্দোলনের হাতে এবং পুরোপুরি ভুলে থাকেন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলিতে গ্রামীণ জনগণের বিরাটভাবে অংশগ্রহণের কথা, তাদের প্রতি এ এক সতর্ক বাণী। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে খাটো করার কোন প্রশ্ন নেই ; কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্লেষণ করার দরকার যেখানে সংবিধান প্রদত্ত রক্ষাকবচ রদ করা হয় অথবা অবজ্ঞা করা হয় সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতি কতটুকু বর্তমান। এই ধরনের পরিস্থিতিতে শ্রমিকের

আন্দোলন গোপনে করতে হয়, অস্ত্র ছাড়া যার প্রতি পদে পদে বিপদ ওঁত পেতে থাকে। গ্রামগুলিতে অবস্থাটা এত কঠিন নয়, সেখানকার অধিবাসীরা সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামকে সমর্থন করে কারণ ঐসব অঞ্চলগুলিতে দমন-পীড়নের শক্তিটা কম অনুভূত হয়।

ভবিষ্যতে যদিও আমরা আরও যত্নশীল বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করব। তবুও মৌলিক যুক্তি হিসাবে আমরা এই তিনটি সিদ্ধান্তকে কিউবান বিপ্লবের অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসাবে তুলে ধরতে চাই।

গেরিলা যুদ্ধের ভিত্তি হচ্ছে, পরিত্রাণের জন্য জনগণের সংগ্রাম। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে সেই সংগ্রামের, যদিও তার অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে জনগণের মুক্তি। এটা অবশ্যম্ভাবী—যেটা এই বিষয়ের ওপর পুস্তক রচয়িতারাও বারবার বলেছেন যে, গেরিলাযুদ্ধের কতকগুলি ক্রমান্বয় বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে, সেগুলি যারা অবজ্ঞা করবে, তারা পরাজিত হবে। সমগ্র সংগ্রামের একটা ধাপ হিসাবে এই সমস্ত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় গেরিল যুদ্ধ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কতকগুলি অনুসিদ্ধান্তও মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যদিও প্রত্যেক দেশের বিশেষ ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিস্থিতি যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে, তবুও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বর্তমানে আমাদের কাজ হচ্ছে এই ধরনের যুদ্ধে মুক্তিকামী জনগণ কি নীতিনিয়ম অনুসরণ করবে তা খুঁজে বার করা, ঘটনা থেকে সূত্র উদ্ভাবন করা, অভিজ্ঞতা প্রসূত বাস্তবতা থেকে অন্যদের জন্য একটা সাধারণ তত্ত্ব খাড়া করা।

প্রথমে এটা নির্ধারণ করতে হবে গেরিলা যুদ্ধে কারা হবে যোদ্ধা? একপক্ষে নিপীড়ক এবং তার দালালদের নিয়ে তৈরি একটা গোষ্ঠী, যাদের সাথী আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শৃঙ্খলাপরায়ণ পেশাদার সৈন্যবাহিনী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বিদেশী সাহায্য পুষ্ট, এর সঙ্গে আছে একদল আমলা যারা এই নিপীড়কদের সেবাদাস।

গেরিলাকে স্থানীয় অঞ্চলের জনগণের সমর্থনের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়। এটা এক অপরিহার্য শর্ত। ব্যাপারটা আরও ভালভাবে বোঝা যাবে একটা উদাহরণ থেকে—কিছু কিছু ডাকাতের দল বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কাজকর্ম চালায়। গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিও মিলে যায় ; সমসত্ততা, দলপতির প্রতি শ্রদ্ধা, সাহসিকতা, অঞ্চলটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং অনেক ক্ষেত্রেই কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে বোঝাপড়া। কিন্তু যেটা তাদের অভাব সেটা হল জনসাধারণের সমর্থন। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তারা ধরা পড়ে অথবা জনগণের শক্তিই তাদের উচ্ছেদ করে।

গেরিলাদের কার্যপদ্ধতি, তাদের যুদ্ধের কলাকৌশল এবং তাদের জনভিত্তি বুঝতে গেলে যে প্রশ্নটার সম্মুখীন হই আমরা, সেটা হল : কেন একজন গেরিলা যোদ্ধা লড়াই করে? একটা অবশ্য গ্রহণীয় সিদ্ধান্তে আমাদের আসতেই হবে যে একজন গেরিলা হচ্ছে সমাজ সংস্কারক যে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের প্রকাশকে মূর্ত্ত করে তোলার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং যে সামাজিক ব্যবস্থা তার নিরস্ত্র

ভাইবোনকে দুঃখ-দুর্দশার ভেতর ঠেলে দেয় তাকে পরিবর্তন করার জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। তারা সঠিক মুহূর্তে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিশেষ অবস্থার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের উৎসর্গ করে তার আগল ভাঙার কাজে। গেরিলাযুদ্ধের কৌশল যখন আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি, দেখা যায়, গেরিলাযোদ্ধার সম্যক পরিচিতি থাকা দরকার তার কর্মক্ষেত্রের জায়গাটি সম্পর্কে, সেখানে প্রবেশ এবং পলায়নের রাস্তাগুলি সম্পর্কে। দ্রুত কুশলী অভিযানে সম্ভাব্যতা, জনগণের সমর্থন এবং লুকানোর জায়গাগুলি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানও থাকা দরকার। এই সমস্ত থেকে বোঝা যায় যে গেরিলা যোদ্ধাদের সংঘর্ষ চালাতে হবে রুক্ষ এবং অল্প জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। যেহেতু এই সমস্ত জায়গায় সংস্কারের জন্য জনগণের সংগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে জমির মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন, বলাই বাহুল্য গেরিলাযোদ্ধাকে হতে হয় গ্রামীণ বিপ্লবী যে গ্রামীণ জনগণের জমির মালিক হবার, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলির মালিকানা পাবার, এক কথায় জীবনের সবকিছু, মায় গোরস্থান পর্যন্ত সবকিছুর মালিক হবার আশা- আকাঙক্ষা বাস্তবায়িত করা চেষ্টা করে।

গেরিলাযুদ্ধের সমকালীন ব্যাখ্যা অনুসারে দু'ধরনের বিভিন্ন পন্থা আছে, এর মধ্যে প্রথমটি একধরনের লড়াই যার সম্পূরক হল বেশ বড়সড় নিয়মিত সৈন্যবাহিনী, যেমনটি ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউক্রেনিয়ান গেরিলাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই ধরনের লড়াইয়ের বিবরণ আমরা এই বিশ্লেষণে রাখছি না। বরং আমরা অন্য ধরনের লড়াইয়ে বেশি উৎসাহী, যেখানে একটা সশস্ত্র বাহিনী একটা সংগঠিত শক্তির সঙ্গে লড়াই করছে, সে ঔপনিবেশিক অথবা অন্যান্য যে কোন শক্তিই হোক ; তারা একটা শক্ত গ্রামীণ ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে লড়াইয়ের পিছনে আদর্শগত কাঠামো যাই হোক না কেন, তার অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে জমির অধিকার।

মাওয়ের চীনে দক্ষিণের শ্রমিকদের একটা দলকে নিয়ে একটা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। সেটি পরাজিত হয় বা বলা যায় প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এটা তখনই সাফল্য লাভ করেছিল যখন গ্রামীণ এলাকাগুলিকে ভিত্তি করে ইয়েনান থেকে 'লঙ মার্চ' সংগঠিত হয়েছিল, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভূমি সংস্কার। ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের লড়াইয়ের সৈনিক ছিল ফরাসীদের ঔপনিবেশিক জোয়ালে নিপীড়িত ধান উৎপাদনকারী কৃষকরা— এই শক্তির উত্থানেই অবশেষে ঔপনিবেশিক শক্তির পরাজয়। দুটি ক্ষেত্রেই পটভূমি ছিল জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ, কিন্তু কোন মতেই জমির লড়াইয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তির থেকে তা বিচ্যুত হয়নি। আলজিরিয়ার ক্ষেত্রে আরব জাতীয়তাবাদের মহৎ ধারণাটা একটা অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা থেকেই উঠে এসেছিল। কারণ প্রায় দশ লক্ষ ফরাসী ঔপনিবেশিক রাই চাষযোগ্য জমির অধিকাংশ ভোগদখল করছিল। কিছু কিছু দেশে, যেমন পুয়েরতো রিকোতে দ্বীপরাষ্ট্রের বিশেষ পরিস্থিতি গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু দৈনন্দিন বৈষম্যের বাতাবরণে জাতীয়তাবাদী সত্তার উন্মেষ ঘটে, কেননা তার মূলে ছিল ইয়াংকী আক্রমণকারীদের দখল থেকে জমির মালিকানা ফিরে পাবার আকাঙক্ষা (যদিও জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশই সর্বহারাতে পরিণত

হয়েছিল)। এই ইচ্ছাকে মূলধন করেই ছোট কৃষক, প্রান্তিক চাষী এবং দাসেরা কিউবার পূর্বদিকের খামারগুলিতে ত্রিশ বছর ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্টের ফলে একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়, এবং গেরিলা বাহিনীর ভরকেন্দ্রের সামর্থ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার প্রচেষ্টা কাজ করে, সেগুলি মাথায় রেখে এটাই মনে করা হয় যে ভ্রূণাবস্থার মধ্যেই সম্ভাবনা নিহিত থাকে। গেরিলাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করা, প্রতিরোধ ও খণ্ডযুদ্ধের লড়াইটা রূপ পরিগ্রহ করে প্রথাসিদ্ধ যুদ্ধের। সেইজন্য মৌলিক নীতি হচ্ছে জেতা ছাড়া কোন যুদ্ধ, প্রতিরোধ বা খণ্ডযুদ্ধই সফল হতে পারে না। একটা বড় অস্বস্তিকর প্রবচন আছে—'গেরিলারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবঞ্চক।' এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, গেরিলা যুদ্ধের জন্য অবশ্যম্ভাবী কিছু গুণাবলী হল শঠতা, আকস্মিকতা আর চরম গোপনীয়তা। স্বভাবতই, পরিস্থিতির চাপে এ এক বিশেষ ধরনের প্রবঞ্চনা, যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় গেরিলা যোদ্ধারা। রোমান্টিকতা এবং খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব থেকে যা একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ আমরা বিশ্বাস করি এটা একটা যুদ্ধ।

যুদ্ধের মধ্যে প্রতিপক্ষ দুই শিবির সবসময়েই একে অপরকে ধ্বংস করতে চায়। শক্তি প্রয়োগের বাইরে তাই যত ধরনের চাতুরি, ধোঁকাবাজি সম্ভব সবকিছুই প্রয়োগ করা হয়। সামরিক রণনীতি ও কৌশল নির্ভর করে কোন বিশেষ দলের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে, নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাদের বিচার পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করে শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। স্থান দখলের লড়াইয়ে, বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটি অংশ গেরিলাবাহিনীর মতই একই পদ্ধতি অবলম্বন করে। সেই একই ধরনের শঠতা, আকস্মিকতা এবং নিশাচরী গোপনীয়তা। যুদ্ধের মাঝে এগুলি অনুপস্থিত থাকার অর্থ, অপর পক্ষে কারোর কড়া নজরদারি। কিন্তু যেহেতু গেরিলাবাহিনী ঢের বেশি সংঘবদ্ধ এবং শত্রুরা পুরো এলাকাটায় নজরদারি চালাতে অক্ষম, গেরিলাদের পক্ষে আকস্মিক আক্রমণ চালানোটা সহজ হয়ে যায় আর এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য।

'আঘাত কর এবং পালিয়ে যাও'—কেউ কেউ ব্যাপারটাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে, কিন্তু এটাই সঠিক পথ। মার, পিছু হটো, গোপন আস্তানায় শত্রুর জন্য অপেক্ষা কর, আবার আঘাত কর এবং পালিয়ে যাও, শত্রুকে হাঁফ ছাড়বার ফুরসৎ না দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এ এক নেতিবাচক মনোভাব, পশ্চাদপসরণের প্রক্রিয়া, সম্মুখ যুদ্ধে অনীহা। কিন্তু অবশ্যই এটা গেরিলাযুদ্ধের সাধারণ রণনীতি, শুধু তাই কেন, যে কোন যুদ্ধেরই অন্তিম কথা এটাই, জয়লাভ কর আর ধ্বংস করো শত্রুকে।

তাই এটা এক প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, গেরিলাযুদ্ধ যুদ্ধের এমন একটা ধাপ যার ভিতরে পরিপূর্ণ জয়লাভ সম্পন্ন করার কোন উপাদান নেই, বরং বলা যায় এটা যুদ্ধের একটা প্রাথমিক ধাপ, যেটা প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে একদিন গেরিলাবাহিনী অর্জন করে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় পৌঁছে তারা শত্রুসৈন্যকে

নির্দিষ্ট আঘাত করতে সক্ষম হয় এবং জয়লাভ করায়ত্ব হয় তাদের। চূড়ান্ত জয়লাভ অবশ্যই এক নিয়মিত বাহিনীর ফসল, যদিও তার শিকড় নিহিত থাকে গেরিলাবাহিনীর সংগঠনে।

তাই যেমন আধুনিক যুদ্ধে কোন ডিভিসনের জেনারেলকে তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীর সামনে মরতেই হবে এমন কোন কথা নেই, গেরিলাযুদ্ধেও, একজন গেরিলা, যে নিজেই তার জেনারেল, তাকেও যে প্রত্যেক যুদ্ধেই মরতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সে তার জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, গেরিলাযুদ্ধের সদর্থক গুণগত দিক হচ্ছে, গেরিলারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে, শুধুমাত্র একটা আদর্শকে রক্ষা করার জন্য নয়, সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য।

এটাই হচ্ছে গেরিলাযুদ্ধের বাস্তব ভিত্তি। একটা বৃহৎ লোকপ্রিয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা সশস্ত্র যোদ্ধাদের একটা ছোট্ট দল যে অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটায় তার মূলে আছে তাদের সেই আদর্শের উপলব্ধি যার দ্বারা তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় একটা নতুন সমাজ, অতীতের সমস্ত পুরানো ধারণাকে ভাঙতে চায়, এবং সর্বশেষে অর্জন করতে চায় সেই সামাজিক ন্যায়, যার জন্য তারা লড়ছে।

এইভাবে দেখতে গেলে ঘৃণাসূচক শব্দগুলোর মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে সত্যিকারের মহত্ত্ব— অন্তিম উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব। আমরা কখনই একথা বলব না যে, অন্তিম লক্ষ্য বিকৃত পন্থার ফসল। লড়াই করার মনোভাব, কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই হতোদ্যম না হয়ে পড়ার মানসিকতা, অন্তিম উদ্দেশ্য অর্জনের পথে বৃহৎ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চরিত্রের অনমনীয়তাই হল গেরিলা যোদ্ধার মহত্ত্ব।

২. গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি

যুদ্ধের পরিভাষায় বলতে গেলে রণনীতি হচ্ছে সামগ্রিক সামরিক পরিস্থিতির পশ্চাৎপটে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় বিশ্লেষণ।

গেরিলা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রণনীতির সঠিক মূল্যায়ণ করার জন্য প্রয়োজন শত্রুর কার্যপ্রণালী সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ। যদি চূড়ান্ত লক্ষ্য হয় সর্বদা বিরুদ্ধপক্ষের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন, তাহলে, গৃহযুদ্ধে শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য হয় গেরিলাদের প্রত্যেকটি অংশকে ধ্বংস করা, অন্যদিকে গেরিলাদেরও শত্রুপক্ষের ঐ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কী ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা উচিত। যেমন তাদের লোকবল কত, তাদের গতিশীলতা, সাধারণ মানুষের সমর্থন তাদের পিছনে আছে কি না, অস্ত্রভাণ্ডার এবং নেতৃত্বের শক্তি। এই সমস্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করে আমাদের নিজেদের সঠিক রণনীতি নির্ণয় করতে হবে, সর্বদাই মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শত্রুর পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে।

কতকগুলি মৌলিক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে : উদাহরণ স্বরূপ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি, বিশ্লেষণ করতে হবে এই ধরনের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক বা বিমান ব্যবহার

করার কার্যকরিতা, শত্রুর কাছে কী ধরনের অস্ত্র মজুত আছে, কোথায় মজুত আছে, সেগুলি ব্যবহারের পদ্ধতি। কারণ গেরিলাদের শক্তির সবচেয়ে বড় ভিত্তি হচ্ছে শত্রুপক্ষের অস্ত্রভাণ্ডার। পছন্দের নিরিখে দেখলে শত্রুদের অস্ত্রের অনুরূপ অস্ত্র থাকা উচিত গেরিলাদের। কিন্তু গেরিলাদের সবচেয়ে বড় ঘাটতি হল অস্ত্রের, যেটা মেটাতে পারে বিরোধী শিবিরই।

লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সবকিছু বিশ্লেষণ করার পরে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ক্রমান্বয় ধাপগুলি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেগুলি আগেভাগেই পরিকল্পনা করে রাখতে হবে, যদিও লড়াইয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং অজানা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মাঝে মাঝেই তা অদল-বদল করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রথমত, গেরিলাযোদ্ধার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে নিজেকে ধ্বংস হওয়া থেকে আটকানো। ধাপে ধাপে, গেরিলা দল বা দলগুলির কাছে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের পদ্ধতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া শক্তিগুলির থেকে পালিয়ে যাওয়াটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

এটা অর্জন করা সম্ভব হলে, গেরিলারা যখন শত্রুর অগম্য জায়গায় আস্তানা গড়তে সক্ষম হবে, অথবা এমন শক্তি সঞ্চয় করবে যাতে তাদের আক্রমণ করতে ভয় পাবে শত্রুসৈন্যরা, তখন গেরিলাদের বিচারক্ষেত্রের আশেপাশে শত্রুদের দুর্বল করার কাজে নেমে পড়তে হবে। পরে তারা শত্রুঘাঁটির অভ্যন্তরে ঢুকেও আক্রমণ করবে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে, আক্রমণ বা হয়রান করতে হবে তাদের কাজের জায়গাগুলিতে, এমন কি মূল ঘাঁটিগুলিতে, সর্বশক্তি দিয়ে গেরিলাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুদের উপর, যেখানে সম্ভব হবে সেখানেই।

আঘাত করতে হবে প্রতিনিয়ত। কোনো জায়গায় আক্রমণে নিয়োজিত শত্রুসৈন্যদের ঘুমানোর ফুরসৎটুকুও দেওয়া চলবে না। তাদের প্রত্যেকটা ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে সেগুলি ধ্বংস করতে হবে। প্রত্যেকটা মুহূর্তে এমন একটা ধারণা গড়ে তুলতে হবে যে তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বনে জঙ্গলে এবং বন্ধুর অঞ্চলে এই অভিযানটা চালাতে হবে দিন রাত্রি উভয় সময়তেই আর বসতিপূর্ণ বা খোলা জায়গায় যেখানে সহজেই শত্রুরা ঘুরে বেড়াতে পারে, এমন জায়গায় আক্রমণ শানাতে হবে কেবল রাত্রির অন্ধকারে! এরজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনপদগুলির সহযোগিতা আর জায়গাটির ভূগোল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কারণ এই দুটি শর্তের উপরেই নির্ভর করে গেরিলা যোদ্ধার জীবন। সেইজন্য, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অঞ্চল সম্পর্কে নিরীক্ষার পাশাপাশি চালাতে হবে স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিপ্লবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার আর এই অকাট্য সত্যিটা তুলে ধরা যে জনগণের বিরুদ্ধে শত্রুসৈন্যের চূড়ান্ত জয়লাভ কখনই সম্ভব নয়। এই অবশ্যম্ভাবী সত্যটা যে বুঝতে পারে না, তার গেরিলা যোদ্ধা হবার যোগ্যতা নেই।

প্রথম কাজ হল, জনগণের মধ্যে এই কাজটা করতে হবে গোপনীয়তার সঙ্গে। প্রত্যেকটি কৃষক এবং যেখানে সংঘর্ষ ঘটতে চলেছে সেখানের সমাজের প্রত্যেকটি

সদস্যকে এই কথাটা বোঝাতে হবে যে, তারা যাই দেখুক বা শুনুক সে ব্যাপারে যেন কোন কথা না বলে। পরে, এই সমস্ত স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে যা বিপ্লবকে আরও বেশি নির্ভরতা দেবে। আরও পরবর্তী সময়ে তাদের লাগানো যেতে পারে যোগাযোগ রক্ষার কাজে, মালপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র বহন করার জন্য অথবা তাদের পরিচিত এলাকায় তারা পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করতে পারে। তাদের কর্মস্থলে ধর্মঘট সংগঠন করা যেতে পারে, চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে যা পরিবর্তিত হতে পারে সাধারণ ধর্মঘটে।

যে কোন গৃহযুদ্ধে ধর্মঘট হচ্ছে একটা প্রয়োজনীয় উপাদান, কিন্তু তা সফল করতে গেলে কতকগুলো সম্পূরক শর্ত অবশ্য প্রয়োজনীয়, যা সব সময়ে উপস্থিত থাকে না কদাচিৎ তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়। এই সমস্ত প্রাথমিক শর্ত সৃষ্টি করতে হয়, যার জন্য দরকার বিপ্লবের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা, জনগণের শক্তি প্রদর্শন আর তার সম্ভাবনা তুলে ধরা।

অন্তর্ঘাত করার কাজে, যদিও অনেক কম বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত নির্দিষ্ট এবং সুসংহত দল পঙ্গু করে দিতে পারে সমগ্র সেনাবাহিনীকে। এই অন্তর্ঘাত হচ্ছে গেরিলাদের একটা ভয়ংকর অস্ত্র। ওরা সেই অঞ্চলের শিল্প ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে, একটা শহরের আলো, জল, সমস্ত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ করে দিতে পারে, কিছু নির্দিষ্ট সময় ছাড়া একটামাত্র রাস্তায় চলাচল করাও নিষিদ্ধ করা হয়। এ রকম ব্যবস্থা করা গেলে, শত্রুর মনোবল ভেঙে যেতে থাকে, তাদের যুদ্ধরত সৈন্যরাও দুর্বল হয়ে পড়ে আর নির্দিষ্ট সময়ে পাকা ফল মাটিতে পড়ার মত সময় ঘনিয়ে আসে।

এভাবে গেরিলা যুদ্ধের সীমানা বিস্তারিত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত বৃদ্ধি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। একটা শক্তপোক্ত ঘাঁটি এবং ক্রমশ তাকে শক্তিশালী করে যাওয়াটাই যুদ্ধ কালীন সময়ে অবশ্য কর্তব্য। যুদ্ধ এলাকার ভিতরে বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে মতাদর্শের লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে। চিরবিরোধী বিপ্লবের শত্রুদের কোয়ারান্টিন করে রাখতেই হবে, সাধারণ কিছু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেমন পরিখা খোঁড়া, মাইন বসানো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ করাও প্রয়োজন।

অস্ত্রশস্ত্র এবং যোদ্ধাদের সংখ্যার নিরিখে যখন গেরিলাদলটির শক্তি একটি ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছায় তখন তাদের আরও নতুন নতুন কলাম (column) খোলা প্রয়োজন। এর সঙ্গে তুলনা করা চলে একটা মৌচাকের, যেখানে এক বিশেষ মুহূর্তে এক নতুন রানীর সৃষ্টি হয়, যে একঝাঁক মৌমাছিসহ চলে যায় অন্য আর এক অঞ্চলে। মূল গেরিলা ঘাঁটিটি থাকবে কম বিপদজ্জনক অঞ্চলে কুশলী গেরিলা নেতাদের তত্ত্বাবধানে, একই সময়ে নতুন দলগুলি শত্রুদের অন্যান্য ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণে যাবে, এইভাবে বৃত্তাকারে চলবে সমগ্র প্রক্রিয়াটি।

এমন সময় হয়তো আসবে যখন সৈন্যদলগুলির অধিকৃত এলাকাগুলো বেশ ছোট আকারের, আবার শত্রুপক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে ঢুকতে গেলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। সেই সময়ে একটা সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি দল

একত্রিত হয়ে স্থান দখলের লড়াই শুরু করে, যুদ্ধটা উন্নীত হয় নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায়। কিন্তু কখনই মূল ঘাঁটির সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না ; শত্রুবাহিনীর পিছনেও তারা নতুন গেরিলাবাহিনী সমাবেশ করে, এইভাবেই শত্রুর দখলীকৃত এলাকা নিয়ন্ত্রণে না আনা পর্যন্ত তারা অনুপ্রবেশ চালিয়ে যায়।

এইভাবে গেরিলারা শত্রুর মূল ঘাঁটিতে আক্রমণের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যায় তাদের পরাস্ত করার অন্তিম লক্ষ্যে, জয়লাভের উদগ্র বাসনায় উত্তাল হয়ে ওঠে জনগণের অংশগ্রহণ, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে কানাচে।

৩. গেরিলা যুদ্ধের কৌশল

সামরিক ভাষ্য অনুযায়ী, কৌশল হচ্ছে মহৎ রণনীতি সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনের বাস্তব পদ্ধতি।

এক অর্থে, তা রণনীতির সম্পূরক, অন্যদিকে এর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে কিছু নিয়ম। কৌশল হল পরিবর্তনশীল চূড়ান্ত লক্ষ্যের থেকেও অনেক বেশি নমনীয় ; লড়াই চলাকালীন প্রতিনিয়ত প্রয়োজন পড়ে তাকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার। যুদ্ধের সময়কালে কতকগুলি রণকৌশল পরিবর্তন নিরপেক্ষ, আবার কতকগুলি পরিবর্তনশীল। প্রথম জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হয়, সেটা হল শত্রুর তৎপরতার সঙ্গে তাল রেখে গেরিলা আক্রমণের ছক কষা।

গেরিলাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল গতিশীলতায়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে, আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুরো এলাকা থেকেই ;যদি অবশ্য দরকার হয়। এই গতিশীলতাই গেরিলাযোদ্ধাকে প্রতিনিয়ত এক ফ্রন্ট থেকে আর এক ফ্রন্টে চলে যেতে এবং যে কোন ধরনের অবরোধে না পড়তে সাহায্য করে। যুদ্ধের পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী গেরিলা দলটি কোন অবরোধের মধ্য থেকে পালিয়ে যেতে পারে, কেননা শত্রুদের কাছে এটিই হল একমাত্র অস্ত্র যার মাধ্যমে তারা গেরিলাদের বাধ্য করতে পারে সামনাসামনি লড়াইয়ে (গেরিলাদের ছোট ছোট দলকে ঘিরে ফেলতে পারে শত্রুরা, যখন তারা নিজেরাই ঘেরাও হয়ে যেতে পারে সবলতর প্রতিপক্ষের দ্বারা অথবা নিরাপদ অবস্থানে থেকে টোপ হিসাবে কাজ করতে পারে গেরিলারা, শেষ পর্যন্ত যা অবরোধের মাধ্যমে পুরো বাহিনীটাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে এবং আক্রমণকারী বাহিনীর সরবরাহটাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে)। এই ধরনের ভ্রাম্যমাণ যুদ্ধের একটি হল 'মিনুয়েট'—এমন নামকরণ করা হয়েছে কারণ, ঐ নামের নাচের সঙ্গে এই লড়াইয়ের একটা সাদৃশ্য রয়েছে। শত্রুসৈন্যের একটা অগ্রগামী বাহিনী হঠাৎ দেখে চারদিক থেকে তারা গেরিলা যোদ্ধাদের দ্বারা অবরুদ্ধ, প্রত্যেকটা দিকে থাকে পাঁচ থেকে ছ'জন গেরিলা যোদ্ধাদের ছোট ছোট দল। যেকোন দিক থেকেই যুদ্ধ শুরু হতে পারে, শত্রুসৈন্য সে দিকে ধাওয়া করে গেলে গেরিলারা পিছু

হটে। তখন শুরু হয় অন্যদিক থেকে আক্রমণ। শত্রুরা একইভাবে সেদিকেও ধাওয়া করে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। গেরিলা দলগুলি পরস্পরে প্রত্যেকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। এই পথে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণে জেরবার হয়ে পড়ে শত্রুসৈন্যরা, তাদের মনোবল ভেঙে যায়। অবশেষে অনেক প্রাণ, অনেক অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে রণে ভঙ্গ দেয় তারা।

একই কৌশল রাত্রেও কার্যকারী হতে পারে, কিন্তু শত্রুর আরও কাছে যেতে হবে এবং বেশি আগ্রাসী আক্রমণও প্রয়োজন, কারণ এই পরিস্থিতিতে পাল্টা অবরোধ হচ্ছে খুব বিপজ্জনক। গেরিলা দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হল রাত্রিতে চলাচল করা, যা তাদের পৌঁছে দেয় আক্রমণের অবস্থানে এবং একটা নতুন অজানা অঞ্চলে সংগঠিত হতে পারে তারা, যেখানে বিশ্বাসঘাতকতার বিপদ ওঁত পেতে থাকতে পারে। তাদের সংখ্যাল্পতার জন্যই দরকার হয়ে পড়ে অতর্কিত আক্রমণ। নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি না করে শত্রুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার জন্য গেরিলাদের এটা মস্ত সুবিধা। একপক্ষে ১০০ জন আর অন্যপক্ষে ১০ জন, এরকম একটি লড়াইয়ে যদি প্রত্যেক পক্ষেরই একজনের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহলে তো বলতেই হবে যে ক্ষতিটা আনুপাতিক নয়। যেহেতু শত্রুসৈন্যের মাত্র এক শতাংশ ক্ষতি, তাই সেটা সহজেই পূরণীয়, কিন্তু গেরিলাবাহিনীর ক্ষতিটা অনেক বেশি, কারণ তারা হারায় একজন বিশেষ সৈন্য, যা অপর বাহিনীর দশ শতাংশের সমতুল।

মৃত গেরিলা যোদ্ধাদের তাদের অস্ত্রশস্ত্র সহ ফেলে যাওয়া উচিত নয়। যখন এক সহযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে, তখন প্রত্যেক গেরিলা যোদ্ধার অবশ্যকর্তব্য যুদ্ধের মহামূল্যবান উপকরণগুলি উদ্ধার করে নিজেদের কব্জায় রাখা। বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার বিস্ফোরক ইত্যাদির, কারণ এগুলির প্রয়োগ পদ্ধতি গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিয়মিত বাহিনী এবং গেরিলা দলের ভিতরে যে কোন সংঘর্ষে একদল থেকে আরেক দলকে পৃথক করা সম্ভব তাদের গুলি চালনার রকমফের দেখে : একটা নিয়মিত বাহিনী ব্যাপক গোলাগুলি বর্ষণ করে আর সেখানে গেরিলা যোদ্ধাদের গুলি বর্ষণ হল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কিন্তু নিশানায় নির্ভুল।

একটা সময়ে, অধুনা মৃত, আমাদের এক বীর সেনানী তার মেশিনগান থেকে ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করেছিল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে, তার উদ্দেশ্যে ছিল শত্রুসৈন্যের অগ্রগতিকে ধীরলয়ে বেঁধে ফেলা। এই ঘটনাটায় আমাদের বাহিনীর ভিতরে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ গুলি চালনার ধরন দেখে তাদের মনে হয়েছিল শত্রুরা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা দখল করে নিয়েছে। এটা ছিল একটা বিরল ঘটনা যখন গোলাগুলি সংরক্ষণের নিয়মটা মানা হয়নি, কারণ জায়গাটার প্রতিরক্ষার জন্য এটা ছিল খুব জরুরী।

গেরিলা যোদ্ধার আর একটা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল নমনীয়তা, যেকোন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা এবং সমস্ত দুর্ঘটনাকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার পারদর্শিতা। প্রথাগত যুদ্ধের কট্টর পদ্ধতির বিপরীতে গেরিলা যোদ্ধারা যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তে আবিষ্কার করে তাদের নিজস্ব কৌশল এবং প্রতিনিয়ত হতচকিত করে শত্রুকে।

প্রথম ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র কিছু স্থিতিস্থাপক অবস্থান থাকে, কতকগুলি নির্দিষ্ট জায়গা যার মধ্যে দিয়ে শত্রুসৈন্য গলতে পারে না। খুব সহজেই সব অসুবিধা কাটিয়ে স্বাভাবিকভাবে এগোতে এগোতে শত্রুরা হতচকিত হয়ে হঠাৎ দেখে অবরুদ্ধ হয়ে তাদের আর এগোবার পথ নেই। যতই তারা সযত্ন নিরীক্ষণের পরে স্থান নির্বাচন করুক, গেরিলা অধিকৃত অঞ্চলগুলি প্রায় অজেয়। কতজন সৈন্য আক্রমণকারী সেটা বড় কথা নয়, কতজন প্রতিরোধ করছে সেটাই বিবেচ্য। তারা যদি ঠিক অবস্থানে থাকে, তবে প্রায় সর্বদাই এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্যকে প্রতিরোধ করা যায়। বাহিনীর প্রধানদের প্রধান কাজ হল প্রতিরক্ষার জন্য সঠিক সময় এবং স্থান নির্বাচন করা, যেখানে পশ্চাদপসরণের সম্ভাবনা থাকবে না।

গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের ধরণটাও আলাদা, তারা শুরু করে চমক, বন্যতা আর হিংস্রতা দিয়ে—হঠাৎ নিজেদের আবার নিষ্ক্রিয়তার খোলসে মুড়ে নিতেও পারে। অবশিষ্ট জীবিত শত্রুরা বিশ্রাম নেয় এই বিশ্বাসে যে আক্রমণকারীরা চলে গেছে। দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যায় তারা। এই সময়েই আরেকটি জায়গায় হয় একই কায়দায় নতুন কোন আক্রমণ আর গেরিলাদলটির মূল অংশ অপেক্ষা করে থাকে শক্তিবৃদ্ধির জন্য। কোন কোন সময়ে গেরিলারা ঝটিতি আক্রমণ করে শত্রু ক্যাম্পের কোন আউটপোস্টে, তাদের হতচকিত করে দখল করে নেয় সেটি। মূল ব্যাপারটা হল হতচকিত করা আর আক্রমণের দ্রুততা।

অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মও খুব জরুরী। অন্তর্ঘাত এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে একটা পরিষ্কার পার্থক্য-রেখা টানা উচিত। প্রথমটি, বিপ্লবী এবং অত্যন্ত কার্যকরী এক রণকৌশল, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের নীট ফল ব্যর্থতা ও বাছবিচারশূন্যতা, কারণ সবসময়েই তাদের বলি হয় নির্দোষ জনগণ ও বিপ্লবের পক্ষে মূল্যবান জীবনগুলিকে তারা ধ্বংস করে। সন্ত্রাসবাদকে একটা মূল্যবান কৌশল বলে মনে করা যায় যখন নিষ্ঠুরতার জন্য, নিপীড়নের পারদর্শিতার জন্য অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, কোন অত্যাচারী শক্তির নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তার অপসারণকে প্রয়োজনীয় বলে ধরে নিয়ে। কিন্তু গুরুত্বহীন ব্যক্তিহত্যা কখনই সমর্থন করা যায় না, কারণ তার ফলে প্রতিশোধ- মূলক কাজকর্ম বেড়ে যায়, যার ফল আরও কিছু অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে একটা খুব বিতর্কিত বিষয় আছে। অনেকের মতে পুলিশী নিপীড়ন ডেকে এনে সন্ত্রাসবাদ প্রায়শই জনগণের সঙ্গে আইনী অথবা আধা-গোপনীয় পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং এক বিশেষ সংকটজনক মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে অসম্ভব করে তোলে। একদিক থেকে এটা সত্যি। কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময় কিছু কিছু শহরে সরকারী শক্তির অত্যাচার এমন এক ভয়ংকর পর্যায়ে চলে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ধরনের আইনী লড়াইকে দাবিয়ে রাখা হয়, এবং সশস্ত্র পন্থা ছাড়া কোন গণসংগ্রাম দানা বাঁধতে পারে না। তাই, হুঁশিয়ারি দিতেই এই ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া এবং বিপ্লবের সাধারণ অনুকূল ফলাফলের মূল্যায়ন করা জরুরী হয়ে পড়ে। যে কোন প্রকারেই হোক, সুন্দরভাবে সংঘটিত অন্তর্ঘাত সর্বসময়েই এক কার্যকরী অস্ত্র। উৎপাদনের

উপায়গুলিকে অচল করে দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা তা জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে পঙ্গু করে দেবে (অন্য কথায় বলতে গেলে, তারা বেকার হয়ে যাবে), এ ছাড়াও সমাজের সাধারণ জীবনটাও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটা নরম পানীয়ের কারখানায় অন্তর্ঘাত প্রচেষ্টা হাস্যকর, কিন্তু একটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে অন্তর্ঘাত চূড়ান্তভাবে সমর্থনযোগ্য। প্রথমক্ষেত্রে, কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজ হারাবে, দ্বিতীয়ক্ষেত্রেও থাকবে কাজ হারানো শ্রমিকরা, কিন্তু আঞ্চলিক জীবনটা পঙ্গু হয়ে যাবে বলে এটা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য। অন্তর্ঘাতের কলাকৌশল সম্পর্কে আমরা আবার পরে আলোচনা করব।

আধুনিক যুগে বিমান আক্রমণ হচ্ছে প্রথাগত সৈন্যবাহিনীর কাছে এক প্রিয়তম অস্ত্র, যা নির্ণায়ক শক্তি বলেও মনে করা হয়। তা সত্ত্বেও, গেরিলাযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে, যখন অল্প কিছু গেরিলা যোদ্ধা সংগঠিত হয় দুর্গম অঞ্চলে, তখন এটা কোনও কাজেই লাগে না। বিমান আক্রমণের কার্যকরিতা তখনই, যখন দৃশ্যমান এবং সংগঠিত প্রতিরোধকে নিয়মিতভাবে ধ্বংস করতে পারে, আর তার জন্য এই ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলা বেশ বড় ধরনের জমায়েতের অস্তিত্ব থাকা চাই, যা এইধরনের যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় কার্যত অনুপস্থিত। বিমান আক্রমণ কার্যকরী হয় যখন মাটিতে সৈন্যদলগুলি মার্চ করে অথবা তাদের অবস্থান থাকে অনাবৃত। অবশ্যই এই ধরনের আক্রমণ সহজেই এড়ানো যায় যদি রাত্রে মার্চ করা যায়।

শত্রুর দুর্বলতম দিকগুলির একটি হল সড়ক এবং রেল পরিবহন ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে পরিবহন পথের প্রতিটি মিটার পাহারা দেওয়া অসম্ভব, তা সে রেলপথই হোক, আর সড়ক যাই হোক না কেন। যে কোন জায়গায় বেশ কিছু পরিমাণে বিস্ফোরক পুঁতে রাস্তাটাকে যাতায়াতের পক্ষে অগম্য করা যায়। যখন একটা গাড়ি ঐ রাস্তায় যায়, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শুধু যে রাস্তাটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তাই নয়, শত্রুর জীবনহানি এবং মালপত্রের ক্ষতিসাধনও করা যায়।

বিস্ফোরকের উৎসটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে সেগুলি আনা যেতে পারে অথবা শত্রু বিমান থেকে ফেলা বিস্ফোরিত না হওয়া বম্বগুলি ব্যবহার করা যায়, যদিও সেগুলি সব সময়ে কাজ করে না। অন্যদিকে, গেরিলা অঞ্চলের ভিতরে গোপন ল্যাবরেটরিতে এগুলি তৈরি করা যেতে পারে। বিস্ফোরণের কৌশলগুলিও বিভিন্ন, গেরিলাদলের অবস্থার উপরে তা নির্ভরশীল।

আমাদের ল্যাবরেটারীতে পাউডার তৈরি করে আমরা 'ক্যাপ' হিসাবে ব্যবহার করতাম। বিভিন্ন ধরনের কৌশল আবিষ্কার করেছিলাম নির্ধারিত জায়গায় খনিতে বিস্ফোরণের জন্য। সবচেয়ে ভাল ফল দিয়েছিল ইলেকট্রিক পদ্ধতি ; কিন্তু প্রথম যে মাইনটি আমরা ফাটিয়ে ছিলাম সেটি ছিল একনায়কতন্ত্রের (বাতিস্তা) একটি বিমান থেকে ফেলা একটি বম্ব। এটা তৈরি করা হয়েছিল বিভিন্ন ক্যাপ ঢুকিয়ে একটি বন্দুকের সঙ্গে যুক্ত করে, যার ট্রিগার টানা দিয়ে রাখা হয়েছিল একটা সুতোর সাহায্যে। শত্রুদের একটা লরি যে মুহূর্তে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, অস্ত্রটার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

এইসব কলাকৌশলগুলির প্রভূত মানোন্নয়ন সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ আমরা জানতে পেরেছি যে, এখন আলজেরিয়াতে ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে টেলি এক্সপ্লোসিভ মাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মাইনগুলি বহুদূর থেকে রেডিওর সাহায্যে বিস্ফোরণ করা হয়।

রাস্তার ধারে ধারে আক্রমণের জন্য গুপ্তস্থান তৈরি করে মাইন বিস্ফোরণ ঘটানো আর বেঁচে যাওয়া জীবিত শত্রুদের খতম করা—অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার সর্বোত্তম পন্থা। হতচকিত শত্রুরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না। পালাবার সময়ও পায় না। কাজেই খুব কম গোলাগুলি খরচা করে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়। আঘাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরাও তাদের কায়দা বদলাবে, বিচ্ছিন্ন ট্রাক পাঠানোর পরিবর্তে তারাও এক ঝাঁক সাঁজোয়া বাহিনী পাঠাবে। অবশ্য, অঞ্চলটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে ঐ বাহিনীকেও ভাঙ্গা সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ ট্রাককে নিশানা করতে হবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে গেরিলা রণকৌশলের কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত মনে রাখতে হবে। সেগুলি হল : অঞ্চল সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য, অতন্দ্র প্রহরা এবং পালানোর রাস্তাগুলি সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ধারণা থাকা দরকার। এছাড়াও দরকার অপ্রধান রাস্তাগুলিতে নজরদারি চালানো যাতে সেই পথে আক্রমণকালে সামরিক শক্তি আমদানি করতে না পারে। এলাকার জনগণের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দরকার এবং সরবরাহ পরিবহণ এবং স্থায়ী বা অস্থায়ী লুকানোর জায়গার সংকুলানের ব্যাপারে তাদের সাহায্য যাতে পাওয়া যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে, দেখতে হবে যদি আহত সহযোদ্ধাদের ফেলে যেতে হয় তাহলে তারা যেন কোথাও আশ্রয় পায়। একটি বিশেষ নির্দিষ্ট আক্রমণের জায়গায় যেন সংখ্যাধিক্য থাকে সেটাও দেখতে হবে, এককথায় পরিপূর্ণ গতিশীলতা এবং রিজার্ভদের সাহায্যের সম্ভাবনার দিকটি খোলা রাখতে হবে।

যদি এই সমস্ত মৌলিক কৌশলগত দিকগুলি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঝটিতি আক্রমণ সত্যিকারের ফল দেয়।

গেরিলা কৌশলের একটি মূলগত বিষয় হল স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার। শত্রুর সঙ্গে ব্যবহারটাও একইরকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আক্রমণের সময়ে আচরণটা হওয়া উচিত সমস্ত ঘৃণার্হ অপরাধের প্রতি চূড়ান্ত অনমনীয়, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের প্রতি অথবা সেই সমস্ত সৈন্য যারা মনে করে তারা সামরিক দায়িত্ব পালন করছে, তাদের প্রতি যতটা সম্ভব ক্ষমাশীল মনোভাব দেখাতে হবে। যখন নিজেদের কোন ঘাঁটি নেই অথবা পরিস্থিতিটা যখন অপরাজেয় নয়, তখন বন্দী করা উচিত নয়। জীবিতদের মুক্ত করে দেওয়া উচিত। যতটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে সমস্ত আহতদের চিকিৎসা করা দরকার। এলাকার মানুষের রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা জরুরী, কারণ এটা কার্যকরীভাবে প্রমাণ করতে হবে যে উৎপীড়ক সৈন্যদের থেকে গেরিলা যোদ্ধাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা অনেক উন্নতমানের।

৪. অনুকূল ভৌগোলিক অঞ্চলে লড়াই

আগেই বলেছি, নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে এমন নয় যে, গেরিলা যুদ্ধ সবসময়েই সংঘটিত হবে অনুকূল অঞ্চলে, অর্থাৎ গেরিলা দল যখন থাকে অগম্য অঞ্চলে অর্থাৎ হয় ঘন জঙ্গলে, খাড়া পাহাড়ে বা দুরতিক্রম্য মরুভূমিতে, জলাভূমিতে। গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সাধারণ কৌশলগুলি সবসময়ই একই।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হল শত্রুকে ব্যস্ত করে রাখা। যদি অঞ্চলটি এমন দুর্ভেদ্য হয় যে, সংগঠিত সামরিক বাহিনীর প্রবেশ সেখানে অসম্ভব, তাহলে গেরিলা দলের উচিত এমন জায়গায় এগিয়ে যাওয়া যেখানে শত্রুকে হাতের নাগালে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেখানে লড়াইয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

নিজেদের টিঁকে থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার সাথে সাথেই গেরিলা বাহিনীর লড়াই শুরু করা উচিত। প্রতিকূল অঞ্চলের মত অত বেশি ভ্রাম্যমান না হলেও চলবে, শত্রুর অবস্থানের সঙ্গে তাদের মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সেইসব জায়গায় যেখানে মুহূর্তের মধ্যে শত্রুপক্ষ প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করতে পারে, সেখানে গেরিলাদের দ্রুত যাতায়াত কাম্য নয়। এই যুদ্ধের রাত্রিকালীন চরিত্রটা খুব প্রয়োজনীয় নয়। আনেক ক্ষেত্রেই দিনের বেলায় আক্রমণ শানানো সম্ভব, বিশেষ করে যোদ্ধা সমাবেশ করাটা, যদিও মাটিতে এবং আকাশে শত্রুর পর্যবেক্ষণের ব্যাপারটা মাথায় রেখে। পাহাড়ে বিশেষ ঘরে অনেক বেশি সময় ধরে সামরিক তৎপরতা চালানো যায়, সেটাও সম্ভব হয় মুষ্টিমেয় গেরিলার সাহায্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধিটাও রুখতে হবে।

শত্রু সৈন্যের ঢোকার রাস্তাগুলোর ওপর নজরদারি গেরিলা যোদ্ধদের একটা অতি আবশ্যিক কর্তব্য। যাতে শত্রুরা শক্তিবৃদ্ধি করতে অসুবিধায় পড়ে, তার জন্য তাদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে যেতে হবে, শত্রুদের আরও কাছাকাছি চলে যেতে পারে তারা, সামনাসামনি যুদ্ধে নেমে পড়তে পারে, মুখোমুখি এবং বেশি সময়ের জন্য, যদিও এ সব কিছুই নির্ভর করে বিশেষ অবস্থার উপর, বিশেষ করে গোলাবারুদের পরিমাণের উপর।

অনুকূল অঞ্চলে লড়াইয়ের বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে যেমন কিছু সুবিধা আছে, অসুবিধাও কম নেই। যেমন, একটি মাত্র লড়াইয়ে এখানে বেশি পরিমাণে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ দখল করা কঠিন। কেননা শত্রুরা এইসব অঞ্চলে বাড়তি সতর্কতা নেয়। (গেরিলা যোদ্ধাদের এটা বিস্মৃত হলে চলে না যে শত্রুরাই হচ্ছে অস্ত্র এবং গোলাবারুদের উৎস)। প্রতিকূল অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি দ্রুততায় গেরিলা দল এখানে অবস্থান নিতে পারে অর্থাৎ একটা ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য যখন তার শত্রুপক্ষের সঙ্গে অবস্থান দখলের লড়াই শুরু হয়; এমন অবস্থায়, যেখানে তারা তাদের কাছে প্রয়োজনীয় কিছু ছোট শিল্প গড়ে তুলতে পারে এ ছাড়াও হাসপাতাল, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গুদামের সুবিধা, প্রচারের মুখপত্র ইত্যাদি থাকতে পারে যা বিমান আক্রমণ এবং দূরপাল্লার অস্ত্রের আওতা থেকে দূরে রাখা যাবে।

এই ধরনের অবস্থায় গেরিলা দল তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তারা, যারা সরাসরি লড়াই করবে না। এমনকি গেরিলাবাহিনীর হাতে যেসব অস্ত্র এসে পড়ে তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে পারে।

গেরিলা দলের আকারটা একান্তভাবেই নির্ভর করে নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর, সরবরাহ পাবার সম্ভাব্যতার উপর, অন্যান্য এলাকা থেকে নিপীড়িত মানুষদের পালিয়ে আসা, অস্ত্রের যোগান এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই একটা নতুন ঘাঁটি গড়ে তোলা এবং নতুন যোদ্ধাদের সাহায্যে তার কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করাই হচ্ছে কার্যকরী প্রচেষ্টা।

এই ধরনের গেরিলা দলের কর্মক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ কতটা বড় হবে সেটা নির্ভর করে সংলগ্ন অঞ্চলের অন্য দলগুলির অবস্থা এবং কার্যক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত তার ওপর। লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছতে কতটা সময় লাগে, সময়টা তার ওপর নির্ভর করে। 'মার্চ'টা রাত্রিবেলা হবে ধরে নিলে চূড়ান্ত নিরাপদ অঞ্চল থেকে লড়াইয়ের ময়দান পাঁচ ছয় ঘন্টার বেশি হওয়া সম্ভব নয়। ছোট ছোট গেরিলা দল যারা নিরন্তর দুর্বল করে চলে শত্রু অঞ্চলকে, তারা অবশ্য নিরাপদ জায়গা থেকে আরও দূরে যেতে পারে।

এই ধরনের লড়াইয়ের জন্য ন্যূনতম বুলেট খরচা করে এমন দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার পছন্দ করা হয়—যার মধ্যে থাকে স্বয়ংক্রিয় ও আধা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। মার্কিন বাজারে যে সমস্ত রাইফেল ও মেশিনগান পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল এম-১ রাইফেল, যাকে বলা হয় গ্যারান্ড। এগুলি ব্যবহার করা উচিত তাদেরই যাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। কারণ এটার মস্ত অসুবিধা হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণে গুলি খরচা করে। মাঝারি ভারি অস্ত্র যেমন, ট্রাইপড মেশিনগান, ব্যবহার করা যায় অনুকূল ক্ষেত্রে, কিন্তু অস্ত্রটি এবং তার চালনাকারী উভয়ের জন্যই বড় ধরনের নিরাপত্তা থাকা দরকার, কারণ আত্মরক্ষার জন্য এই অস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়, আক্রমণের জন্য নয়।

পঁচিশজনের একটি গেরিলাদলের অস্ত্রসম্ভারের পক্ষে আদর্শ হচ্ছে দশ থেকে পনেরোটা সিঙ্গল-শট রাইফেল এবং কমবেশি দশটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র—যার মধ্যে থাকবে গ্যারান্ড এবং হস্তচালিত মেশিনগান, আরও থাকবে হালকা এবং বহনযোগ্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, যেমন ব্রাউনিং বা আরও আধুনিক Belgian FAL এবং M-14 স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। সবচেয়ে ভাল হস্তচালিত মেশিনগানের মধ্যে আছে নয়-মিলিমিটার গান, কারণ তাতে অনেক গুলি বারুদ ভরা যায়। গঠনটা যত সরল হবে, তত বেশি কার্যকরী হয় অস্ত্রগুলো, কারণ তাতে কোন যন্ত্রাংশ খারাপ হলে প্রতিস্থাপন করার সুযোগ থাকে। সবকিছুই নির্ভর করে শত্রুরা কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে তার উপর, কারণ তাদের ঐ গোলা-গুলি তো আমরাই ব্যবহার করব যখন ওগুলি আমাদের হাতে পড়বে। ভারী অস্ত্রগুলি আসলে ব্যবহার করা অসম্ভব। এই সমস্ত অঞ্চলে বিমান থেকে কিছু দেখা যায় না, তাই ওগুলি ব্যবহার করে না শত্রুরা। ট্যাঙ্ক আর কামান খুব বেশি কিছু করতে পারে না কারণ ওগুলির রাস্তা করা বেশ কঠিন।

খুব দরকারী জিনিস হল সরবরাহ। এই কারণে দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ সেখানে কেবল কয়েক ঘর কৃষক থাকে, তাই পশু এবং খাবার সরবরাহ খুবই অল্প। একটা স্থায়ী সরবরাহ লাইন গড়ে তুলতে হবে কারণ কোনও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে নির্ভর করতে হয় সঞ্চিত খাদ্যের উপর।

এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধাঞ্চলে সাধারণত বড় আকারে অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা কম। অগম্য হওয়ার জন্য সেখানে টেলিফোন লাইন, সেচ প্রণালী ইত্যাদি নেই বললেই চলে—তাই সেগুলি সরাসরি ধ্বংস করার কোন সুযোগই নেই।

সরবরাহের জন্য পশুর ভূমিকা অনস্বীকার্য, রুক্ষদেশে খচ্চর হচ্ছে সবচেয়ে উপযোগী। তাদের খাদ্যের জন্য পশুচারণভূমি খুব দরকার। পর্বত সঙ্কুল দেশে অন্যান্য পশুরা যা পারে না, খচ্চর সে কাজটা পারে। তবে খুব কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষকেই পরিবহনের দায়িত্ব নিতে হয়। অনেক দিন ধরে প্রতিদিন বেশ অনেক ঘন্টা একজন মানুষ ২৫ কিলোগ্রাম মাল বইতে পারে।

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী অনেকগুলি ঘাঁটি থাকা উচিত, যাতে থাকবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য লোকজনেরা। এখানে রসদ জমা করে রাখা হবে এবং সংকটজনক মুহূর্তে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা আত্মগোপন করে থাকতে পারে। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাও তৈরি করতে হবে, তার বিস্তৃতি নির্ভর করবে গেরিলা দলটি কতটা উন্নত হতে পেরেছে তার উপর। সম্প্রতি কিউবার বিপ্লবী যুদ্ধে, যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কোন অঞ্চলে, অনেক কিলোমিটার টেলিফোন লাইন বসানো হয়েছে, রাস্তা তৈরি হয়েছে এবং ন্যূনতম সময়ে সমস্ত এলাকায় খবরাখবর আদান প্রদানের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেছে।

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আরও কিছু সম্ভাব্য উপায় আছে, যেগুলি আমরা কিউবান বিপ্লবে ব্যবহার করি নি, কিন্তু সেগুলি খুব কার্যকরী যেমন,—ধোঁয়া সিগন্যাল, আয়নার আলো প্রতিফলিত করিয়ে সিগন্যাল এবং সংবাদ বহনকারী পায়রা।

গেরিলাদের কাছে ভীষণ প্রয়োজনীয় বিষয় হল অস্ত্রগুলিকে পরিচর্যা করা, গোলাবারুদ দখল করা এবং সবার উপরে ঠিকঠাক জুতোর সরবরাহ। তাই শিল্প তৈরি করার প্রাথমিক উদ্যোগ হওয়া উচিত এই সমস্ত প্রয়োজনীয়তা যাতে পূরণ করা যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রাথমিকভাবে মুচিদের দোকানগুলিকেই জুতোর কারখানা হিসাবে ব্যবহার করে পুরানো জুতোর মেরামত করা যেতে পারে। পরে সেগুলিকে সংগঠিত ফ্যাক্টরীতে পরিণত করা যায় গড়ে প্রতিদিন ন্যূনতম সংখ্যায় জুতো তৈরি করার জন্য। পাউডার তৈরি করা বেশ সহজ, ছোট একটা ল্যাবরেটরিতেই বাইরে থেকে কাঁচা মাল আনিয়ে এটা করা যায়। শত্রুর কাছে একটা গুরুতর বিপদ হচ্ছে মাইন। বিরাট এলাকা জুড়ে মাইন পেতে একটার পর একটা বিস্ফোরণ ঘটানো যায়, যা শত শত শত্রুসৈন্যকে নিকেশ করে।

৫. প্রতিকূল অঞ্চলে লড়াই

সেরকম একটা পাহাড়ী নয়, জঙ্গলও নেই, এবং অনেক রাস্তা আছে এরকম অঞ্চলে, গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক কৌশলগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে, শুধুমাত্র রকমফের করতে হবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রটিকে। গুণগত নয়, সংখ্যাগত যুদ্ধকৌশলটিকে পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আগে যা বলেছি সবকিছু অনুসরণ করেও, এইসব জায়গায় গেরিলাদলটির যাতায়াত হতে হবে বেশ অন্যরকম ; আঘাতটা হানতে হবে রাত্রিতে বিস্ফোরণের মত খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন হতে হবে গেরিলাদের ; যেখান থেকে শুরু করবে তার থেকে অন্য জায়গায় সরে আসতে হবে, যতটা সম্ভব লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে অন্য জায়গায় যাতে উৎপীড়ক শক্তিগুলি মনে করতে শুরু করে যে, কোন জায়গাই তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

একজন গেরিলা রাত্রিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতে পারে, একদম ভোরের সময়ও হাঁটা যেতে পারে, যদি অবশ্য লড়াইয়ের ক্ষেত্রটিতে যেন নজরদারি না থাকে বা আরও একটা বিপদ আছে স্থানীয় লোকজনের দিক থেকে, তাদের মধ্যে কেউ যদি গেরিলা বাহিনীর চলাচল দেখে তাদের যাওয়ার পথ সম্পর্কে শত্রুসৈন্যবাহিনীর কাছে সংবাদ দিয়ে দেয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাত্রিতে অভিযান চালানোই কাম্য, অভিযানের শুরুতে এবং শেষে যথাসম্ভব শান্ত থাকতে হবে। এখানেও সাধারণ নীতির কিছু ব্যতিক্রম হবে, কারণ কিছু সময়ে ভোরবেলা হতে পারে প্রকৃষ্ট সময়। কখনই শত্রুকে অবহিত করতে নেই যুদ্ধের কোন বিশেষ কায়দা সম্পর্কে, প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করতে হয় জায়গা, সময় এবং যুদ্ধের আদবকায়দা।

আমরা আগেই বলেছি অভিযানটা কখনই দীর্ঘ হবে না, কিন্তু কাজ করতে হবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে, সেটি হবে অত্যন্ত কার্যকরী, মাত্র কয়েক মিনিট যার স্থায়িত্ব, যার শেষে ঝটপট অভিযানস্থল থেকে সরে আসতে হবে। অনুকূল পরিবেশে যে সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, এখানে সেগুলি ব্যবহার করা যাবে না। বড় সংখ্যায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রই এখানে কার্যকরী। রাত্রিতে আক্রমণের সময় লক্ষ্যভেদ কুশলতা নির্ণায়ক শক্তি নয়, বরং নির্ভর করে গুলি চালনার উপর। অল্প দূরত্বে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে যতবেশি গুলি চালানো যাবে, শত্রুকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

এ ছাড়াও, রাস্তায় মাইন পাতা এবং সেতু উড়িয়ে দেওয়া কৌশলের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সময় বা অধ্যবসায়ের দিক থেকে দেখলে গেরিলা আক্রমণ হয়তো কম আক্রমণাত্মক, কিন্তু তারা ভয়ংকর হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, যেমন মাইন, শটগান ইত্যাদি ব্যবহার করে। প্রচুর সৈন্য বহনকারী খোলা ট্রাক, যা সৈন্যদের স্থানান্তরিত করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এমনকি ঢাকা দেওয়া যানবাহন যাতে বিশেষ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে না বা বাসের বিরুদ্ধে শটগান হচ্ছে দারুণ এক অস্ত্র। দূরপাল্লার শটগান দারুণ কার্যকরী। এটা কেবলমাত্র গেরিলাযুদ্ধের গোপনকথা নয়, একে ব্যবহার করা হয় সমস্ত প্রধান যুদ্ধে। উত্তর-আমেরিকানরা শটগান এবং বেয়নেটে সজ্জিত সৈন্যদল কাজে লাগিয়েছিল মেশিনগানের প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে।

একটা জরুরী সমস্যা হচ্ছে গোলাবারুদের, যা সব সময়েই কেড়ে নেওয়া হয় শত্রুদের থেকে। এইজন্য এমন জায়গায় আঘাত হানা জরুরী যেখানে গোলাগুলি যা খরচ করা হবে তা ফিরে পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। অন্য কথায়, একদল সৈন্যের বিরুদ্ধে কখনই আক্রমণ শানানো উচিত নয় যদি সেখানে নিজেদের গোলাগুলি খরচ করে তা পুষিয়ে নেবার সুযোগ না থাকে। গেরিলা রণকৌশলের একটা প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমাগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখা। এইজন্য, গেরিলাদের অস্ত্রশস্ত্রও শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রের অনুরূপ হতে হবে, কেবল রিভলবার আর শটগান ছাড়া, যার গুলি স্থানীয়ভাবে বা শহরে সহজলভ্য।

এই ধরনের গেরিলা দলের সদস্যসংখ্যা ১০ থেকে ১৫ এর বেশি হওয়া উচিত নয়। একটা একক যুদ্ধের জন্য দল গঠন করতে গেলে সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার হল সংখ্যার সীমারেখা বজায় রাখা : ১০, ১২ বা ১৫ জন গেরিলা যেকোন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে এবং একই সময়ে পরস্পরকে সাহায্য করে শত্রুর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। ৪ বা ৫ জন আবার সংখ্যায় খুব অল্প হয়ে যাবে। তখন শত্রুদের পক্ষে গেরিলাদের শিবিরে অথবা যাতায়াতের পথে তাদের আবিষ্কার করে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে।

মনে রাখা দরকার যে, গেরিলাদের চলার গতি হওয়া উচিত তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধীর গতির সদস্যটির অনুরূপ। ২০, ৩০ বা ৪০ জন গেরিলার মধ্যে একইরকম চলার গতি বজায় রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। এটা সম্ভব ১০ জনের ক্ষেত্রে। সমতলে গেরিলাযোদ্ধাকে অতি অবশ্যই একজন দৌড়বীর হতে হবে। আঘাত কর এবং পালিয়ে যাও—এই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সমতলে গেরিলাদের ঘেরাও হয়ে যাওয়ার অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, একটা দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য নিরাপদ জায়গাও খুঁজে পায় না তারা। তাই তাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে বাস করতে হয়। কারণ পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কোন স্থানীয় লোককে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক হতে পারে। শত্রুর প্রতিহিংসা বড় হিংস্র, স্বভাবতই তা নৃশংসতার আকারে নেমে আসে পরিবারের প্রধানের উপরে, বাড়ির মহিলারা এবং শিশুরাও রেহাই পায় না তার হাত থেকে। ব্যক্তি মানুষের উপরে চাপটা এত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যে দৃঢ়তা হারিয়ে যে কোন মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করে সে প্রকাশ করে ফেলে গেরিলা দলটির অবস্থান এবং কিভাবে তারা কাজকর্ম চালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘেরাও শুরু হয়, তারপরে অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি, যদিও সব সময়ই তা দুর্দশার পর্যায়ে পড়ে না। যখন পরিস্থিতি অস্ত্রের পরিমাণ এবং জনগণের বিদ্রোহী সত্তা দাবী করে যোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি, তখন গেরিলা দলকে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন হলে সবাইকে নিয়ে নতুন করে দল গঠন করে একটা বিশেষ মুহূর্তে আঘাত হানা যেতে পারে। কিন্তু সেটা এমন উপায়ে হতে হবে যাতে হামলার অব্যবহিত পরেই তারা পৃথক এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং আর ১০,১২ বা ১৫ জনের দলে ভাগ হয়ে যেতে পারে।

সমগ্র সেনাবাহিনীটিকে একজনের অধীনে সংগঠিত করা যেতে পারে। প্রতিটি

দলের জন্য একজন গেরিলা প্রধান নির্বাচন করতে হবে যে আদর্শগত এবং ব্যক্তিগতভাবে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে সংযোগ রাখবে, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গেরিলারা বাজুকার মত ভারী অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, কারণ এটা সহজে পরিবহনযোগ্য এবং কাজে লাগে। এখনকার দিনে রাইফেলে ছোঁড়া যায় এমন ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী গ্রেনেড এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। সাঁজোয়া গাড়ি এমনকি সৈন্যবাহী খোলা ট্রাক এবং খুব অল্প সময়ে কয়েকজন সৈন্যের সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত হানার জন্য বাজুকা হচ্ছে আদর্শ, কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে একজন লোক কেবল তিনটি সেল বহন করতে পারে, যেটা করতেও বেশ কসরৎ লাগে।

শত্রুর কাছ থেকে যখন ভারী অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়, স্বভাবতই কোন কিছুই অবজ্ঞা করার মত নয়। কিন্তু কিছু অস্ত্র আছে, যেমন ট্রাইপড মেশিনগান, ভারী ৫০ মিলিমিটার মেশিনগান ইত্যাদি,—এগুলি যখন দখল করা হয়, মনে রাখতে হবে যে, ওগুলি আবার হারাতে হতে পারে। কারণ যে পরিস্থিতির কথা আমরা বলছি, অর্থাৎ প্রতিকূল অবস্থায় লড়াই, সেখানে ভারী মেশিনগান অথবা এই ধরনের অন্য অস্ত্র রক্ষার জন্য লড়াইয়ের অনুমতি দেওয়া হয় না। সেগুলি ব্যবহার করার পরে কৌশলগত কারণেই সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। আমাদের কিউবার মুক্তিযুদ্ধে একটি অস্ত্র পরিত্যাগ করা এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, এরকম একটিও ঘটনা অবশ্য ঘটে নি। তা সত্ত্বেও আমরা এইটা ব্যাখ্যা করার জন্য বলছি যে, একমাত্র এই ধরনের পরিস্থিতিতে অস্ত্র পরিত্যাগ করা সে ধরনের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ না হতেও পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গেরিলার অস্ত্র হল দ্রুত আক্রমণের জন্য ব্যক্তিগত হাতিয়ার।

সাধারণত দেশের কৃষককুল বাস করে সুগম এলাকায়, যেখানে রসদ সরবরাহ করা সহজ হয়। বিশ্বাসী লোক আর প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ রক্ষার কারণে জনগণের কাছে সরবরাহ পৌঁছায়। সময় এবং টাকা খরচা করে বিপজ্জনক উপায়ে সংগ্রহ করা ব্যতিরেকে গেরিলা দলের টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। এটা বলাই বাহুল্য যে, গেরিলাদের সংখ্যা যত কম হবে, তাদের খাবার যোগান দেওয়া তত সহজ হবে। প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন বিছানা, জলনিরোধক বস্ত্র, মশারি, জুতো, ঔষধপত্র এবং খাবার এলাকার ভিতরেই পাওয়া যায়, কারণ এইসব জিনিসপত্র স্থানীয় লোকজন প্রতিদিন ব্যবহার করে।

বেশি সংখ্যক গেরিলা এবং অনেক রাস্তাঘাট থাকলে সংযোগ রক্ষার কাজটা সহজ হয়, কিন্তু নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দূরবর্তী জায়গাগুলির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ এক বিরাট সংখ্যক সংযোগরক্ষাকারীর উপর নির্ভর করতে হয়, যারা অতি অবশ্যই বিশ্বাসী হবে। কোন একজন সংবাদবাহক যে প্রতিনিয়ত শত্রুদের সীমারেখা অতিক্রম করে তার যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবার বিপদ আছে। যদি বার্তাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ না হয়, সেটা মৌখিক হতে পারে, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হলে সাংকেতিক ভাষায় সেটি লিখতে হবে। অভিজ্ঞতার থেকে দেখা যায় যে, মুখে বলা কথা অনেক সময়েই বিকৃত হয়ে যায়।

এই একই কারণগুলির জন্য শিল্পের তেমন একটা গুরুত্ব নেই, আর সেগুলোতে

কাজকর্ম চালানোও খুব কঠিন। জুতো অথবা অস্ত্র তৈরি করতে পারে এরকম কারখানা রাখা সম্ভব নয়। বাস্তবসম্মত হচ্ছে, শিল্প সীমাবদ্ধ থাকবে ছোট ছোট কারখানায়, সেগুলিকে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে হবে। শটগানের সেল সেখানে 'রিচার্জ' করা যাবে: মাইন, সাধারণ গ্রেনেড সহ আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেখানে তৈরি হবে। অন্যদিকে, স্থানীয় বন্ধুমনোভাবাপন্ন ছোট কারখানাগুলি ব্যবহার করা যাবে দরকারী জিনিস তৈরি করার জন্য।

যা বলা হল তার থেকে যুক্তির দিক থেকে দুটো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি। প্রথমত, গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজনে একটা স্থায়ী শিবির গড়ে তোলার জন্য অনুকূল শর্তগুলি নির্ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উৎপাদনের উন্নতি কতটা হবে। সমস্ত অনুকূল অবস্থা, জীবনধারণের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য জনসাধারণকে তার বসতি গড়তে সাহায্য করে ; কিন্তু গেরিলাদের পক্ষে ব্যাপারটা পুরোপুরি উল্টো। সমাজজীবনের সুযোগ-সুবিধা যত বেশি হবে, গেরিলা যোদ্ধার জীবনের নিশ্চয়তা তত কমবে, সে তত বেশি যাযাবর হয়ে পড়বে। বাস্তবে, এটাই এক এবং অদ্বিতীয় নীতির ফল। এই অংশের শিরোনাম 'প্রতিকূল অঞ্চলে লড়াই'—কারণ যা কিছু মানুষের জীবনের প্রতি অনুকূল: যোগাযোগ ব্যবস্থা, এক বিরাট সংখ্যক লোকের শহরে এবং আধা শহরে এলাকায় জড়ো হওয়া, যন্ত্রের দ্বারা জমি কর্ষণ—এই সমস্ত জায়গায় গেরিলা যোদ্ধারা থাকে অসুবিধাজনক অবস্থায়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল, যেহেতু গেরিলা যুদ্ধের একটা মস্ত বড় জরুরী কাজ হল জনগণের মধ্যে কাজ করা, তাই এই বিশেষ কাজটি প্রতিকূল অঞ্চলে আরো বেশি দরকারী, কেননা সেখানে একটামাত্র শত্রু হানার ফলে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। প্রতিনিয়ত চালাতে হবে মতাদর্শগত প্রচার, পাশাপাশি ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী শ্রমিক কৃষক এবং অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য গঠনের লড়াই যাতে গেরিলাদের প্রতি একটা সমজাতীয় মনোভাব গড়ে ওঠে। জনগণের মধ্যে এই কাজ করা, গেরিলাদল এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্কের বিরাট সমস্যার প্রতি প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখা—এসব কিছুই একজন বেয়াড়া শত্রুসৈন্যদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীকেও নিয়ন্ত্রণ করে ; নির্দ্বিধায় তাকে নিকেশ করাটাই কাম্য। এ ব্যাপারে গেরিলা বাহিনীকে কড়া হতেই হবে। নিরাপত্তাহীন কর্মক্ষেত্রে শত্রুদের অস্তিত্ব থাকতে দেওয়া যায় না।

৬. শহরাঞ্চলে যুদ্ধ

যুদ্ধের সময়ে, যদি গেরিলাবাহিনী শহরের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় এবং তার উপকণ্ঠে কিছু নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করতে অনুপ্রবেশ করে, তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই শহরে দলগুলিকে বিশেষ ধরনের শিক্ষা দেওয়ার বা বলা যায় বিশেষ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার।

এটা অবশ্যস্বীকার্য যে, একটা শহুরে গেরিলাবাহিনী স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গড়ে ওঠে না। টিকে থাকার কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত সৃষ্টি হবার পরেই তার জন্ম হয়। তাই, শহুরে গেরিলারা সর্বদাই থাকবে অন্য অঞ্চলের নেতৃত্বের সরাসরি তত্ত্বাবধানে। এই গেরিলারা কখনই নিজস্ব স্বাধীন কার্যক্রম অনুসরণ করতে পারে না, যেটা পারে সেটা হল সামগ্রিক কৌশলগত পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন, যাতে অন্যান্য স্থানে অবস্থিত বড় বড় দলগুলির কার্যক্রমে তারা মদত দিতে পারে, বিশেষ কৌশলগত লক্ষ্যের সাফল্যের অবদান স্বরূপ। কিন্তু অন্যান্য গেরিলা বাহিনীর মত এর কার্যক্রমের স্বাধীনতা থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শহুরে দল তার কাজের প্রকৃতি কি হবে সেটা নির্ধারণ করতে পারে না : টেলিফোন লাইন ধ্বংস করতে হবে, না কি অন্য জনপদ আক্রমণ করতে হবে অথবা দূরবর্তী কোন রাস্তায় টহলদার সৈন্য দলকে হঠাৎ আক্রমণ করবে—তাদের যা বলা হবে সেটুকুই করবে। যেটুকু কাজ তাকে দেওয়া হবে সে টেলিফোন বা ইলেকট্রিক খুঁটি উপড়ানো, নিকাশী ব্যবস্থার ধ্বংস, রেলপথ বা জল সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন, সেটুকুই নিখুঁতভাবে করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তার কার্যক্রম।

তাদের সংখ্যা চার থেকে পাঁচ জনের বেশি হবে না। সংখ্যার উপর সীমারেখা টানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের কাজ করতে হয় চূড়ান্ত প্রতিকূল অঞ্চলে যেখানে শত্রুর সদা সতর্ক দৃষ্টি, বদলা এবং বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা খুব বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। আরও একটা বিপজ্জনক বিষয় হল শহরের গেরিলারা তাদের কার্যক্ষেত্রের থেকে বেশি দূরে যেতে পারে না। কাজেই দ্রুততার সঙ্গে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া এবং পরমুহূর্তেই সেখান থেকে পিছিয়ে আসা—এর জন্য দরকার সাধ্য অনুযায়ী নিজেদের ঘাঁটি থেকে কার্যক্ষেত্রের দূরত্বের সীমারেখা নির্ধারণ করা এবং আরও প্রয়োজন দিনের বেলাটা পুরোপুরি লুকিয়ে থাকা। এই দলটি কেবলমাত্র রাত্রিতেই কাজ করতে পারে। কোন অবস্থাতেই এর কাজের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না শহর অবরোধে এরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে বিদ্রোহের চূড়ান্ত সময়ে।

এই প্রতিকূল অঞ্চলে লড়াইরত প্রতিটি গেরিলা যোদ্ধার সবচেয়ে বড় গুণ যা দরকার, তা হল নিয়মানুবর্তিতা—সম্ভবত সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের এবং অবশ্যই বিচক্ষণতা। বন্ধুভাবাপন্ন দু'তিনটি পরিবারের বাইরে কারও ওপর খাবারের জন্য নির্ভর করা যাবে না ; এটা প্রায় নিশ্চিত যে, এই পরিস্থিতিতে ঘেরাও হয়ে যাওয়ার অর্থ মৃত্যু। এ ছাড়াও, অন্যান্য দলেরা যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে, এদের অস্ত্রও সেরকম নয়। অস্ত্রগুলি হবে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার জন্য। তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়া অথবা লুকানো আস্তানার কোন ক্ষতি হওয়ার মত অস্ত্র সেগুলো নয়। দলটির কাছে একটি বা দুটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থাকবে, অন্যান্য সদস্যদের জন্য পিস্তল।

তারা মূলত চেষ্টা চালাবে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের, কখনই সশস্ত্র আক্রমণ করবে না, কেবল শত্রুসৈন্যের দু'একজন সদস্যকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে।

এর জন্য তাদের দরকার অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি। গেরিলা যোদ্ধার থাকা উচিত ভাল করাত, বেশ কিছু পরিমাণে ডিনামাইট, রেললাইন উপড়ানোর জন্য গাঁইতি আর

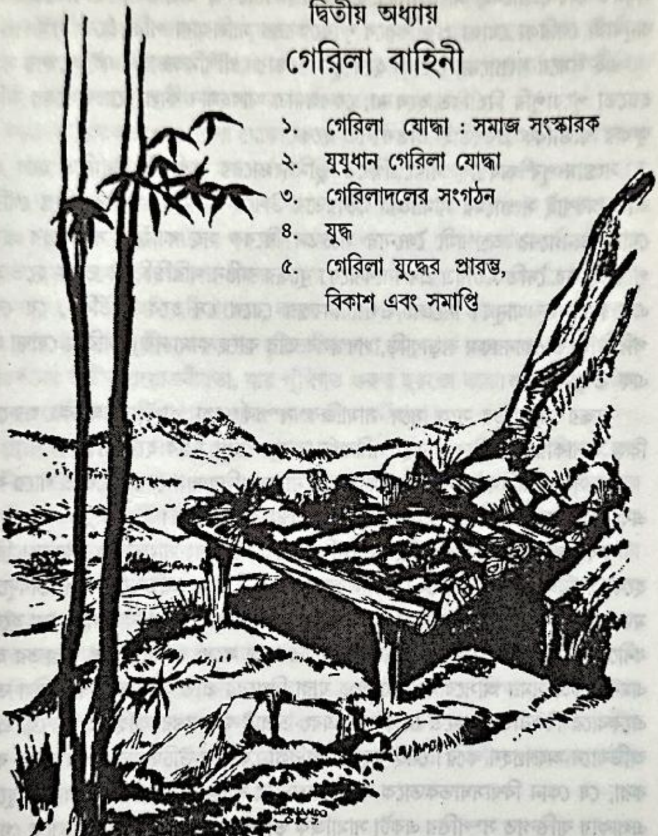
শাবল এবং সাধারণভাবে বিশেষ কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি। জিনিসগুলি নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে, কিন্তু অবশ্যই যাদের দরকার তাদের নাগালে।

একটার বেশি গেরিলা দল থাকলে তারা নির্ভর করবে একজন প্রধানের কর্তৃত্বের উপর, যিনি নির্দেশ পাঠাবেন একজন সাধারণ নাগরিকের মাধ্যমে যার বিশ্বাসযোগ্যতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, গেরিলা যোদ্ধারা শান্তির সময়ের মত কাজকর্ম চালু রাখতে পারে, কিন্তু সেটা খুব কঠিন। আসলে শহরে গেরিলা দল গঠিত হবে একদল লোকের দ্বারা, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যারা ইতিমধ্যেই আইনের চোখে অপরাধী বলে পরিগণিত।

শহরের সংগ্রামের গুরত্ব অপরিসীম। এই ধরনের একটা ভাল অভিযান ঐ অঞ্চলের ব্যবসায়িক এবং শিক্ষাগত জীবনকে পঙ্গু করে দিতে পারে এবং সমস্ত জনগণকে একটি অস্থির পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। তারা ক্রুদ্ধ হয়, এই অনিশ্চিত অবস্থার যাতে পরিসমাপ্তি ঘটে তার জন্য হিংস্র ঘটনার জন্য উদগ্রীব হয়। যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকেই, যদি এই লড়াইয়ের ভবিষ্যত সম্ভাবনা আগাম অনুমান করে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংগঠন তৈরির কাজ শুরু করা যায়, আরও বেশি দ্রুত লড়াই সম্ভব এবং তাতে মানুষের জীবন এবং মূল্যবান সময় রক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গেরিলা বাহিনী



১. গেরিলা যোদ্ধা : সমাজ সংস্কারক

ইতিমধ্যেই আমরা গেরিলা যোদ্ধাকে চিহ্নিত করেছি এক ব্যক্তি হিসাবে, যে জনগণের মুক্তির আকাঙ্খার শরিক এবং সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায় নিঃশেষিত হবার পর, সংগ্রাম শুরু করে এবং কালক্রমে নিজেকে সংগ্রামী জনগণের এক সশস্ত্র সেনামুখ হিসাবে নিজেকে পরিবর্তিত করে। যুদ্ধের শুরু থেকেই গেরিলা এক অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং প্রায় লুকানো এক ইচ্ছা মনে পুষে রাখে পুরানো ব্যবস্থাকে নতুনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার।

এ-ও বলেছি আমরা যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে, অন্তত আমেরিকা এবং প্রায় সব

অনুন্নত দেশে, গ্রামেই আছে সংগ্রামের আদর্শ পরিবেশ, তাই মৌলিক সামাজিক দাবী অনুযায়ী গেরিলা যোদ্ধা শুরু করবে কৃষিক্ষেত্রের মালিকানা পরিবর্তনের কর্মকাণ্ড।

এই সময়ে সংগ্রামের পতাকা হবে ভূমিসংস্কার। প্রাথমিকভাবে, এই লক্ষ্যের সংজ্ঞা হয়তো পুরোপুরি নির্ধারিত হবে না, কেবলমাত্র আবহমান কাল ধরে কৃষকের জমির, ক্ষুধার স্বাভাবিক প্রবণতাই প্রতিফলিত হবে।

সংগ্রাম-পূর্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিসংস্কারের শর্তগুলি নির্ধারিত হবে এবং অতি অবশ্যই সংগ্রামের সামাজিক গভীরতার উপরে তা নির্ভর করবে। কিন্তু গেরিলা যোদ্ধা জনগণের অগ্রগামী সৈন্যের সচেতন বিবেক সহ কাঙ্খিত সংস্কারের প্রকৃত পুরোহিতের নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করবে। যুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতিতে তাকে হতে হবে এক নিরাসক্ত মানুষ। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে সে হবে নীতিনিষ্ঠ, যে কোন পরিস্থিতিতে কোনরকম বাড়াবাড়ি, পদস্খলন তার কাছে কাম্য নয়। গেরিলা যোদ্ধা হবে এক তপস্বীর মত।

যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কগুলো পাল্টাতে থাকে। শুরুতেই কিন্তু এলাকার সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা সম্ভব হবে না।

যে সমস্ত জিনিস টাকা দিয়ে কেনা যাবে না সেগুলির দাম দেওয়া যেতে পারে বণ্ডে এবং প্রথম সুযোগেই তা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

কৃষককে সবসময় কারিগরী, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সহায়তা দিতে হবে। গেরিলা যোদ্ধা হল যেন কোন অঞ্চলে নেমে আসা অভিভাবকরূপী দেবদূতের মত, যে সর্বদা গরীবদের সাহায্য করবে আর যুদ্ধের প্রথম ধাপে কিছু পরিমাণে হলেও ধনীদের বিব্রত করবে। কিন্তু যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, দ্বন্দ্বটা ক্রমশ তীক্ষ্ণতর হবে, এমন একটা সময় আসবে যখন শুরুতে যারা বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তারা একেবারে বিপরীত মেরুতে চলে যায় এবং তারাই জনগণের বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সেই মুহূর্তে গেরিলা যোদ্ধার উচিত জনগণের স্বার্থে কাজ করা, যে কোন বিশ্বাসঘাতকতাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তি প্রদান করার মাধ্যমে। যুদ্ধের এলাকায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা সামাজিক ভূমিকা থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে, ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটুকু জমি এবং গবাদি পশু একটি সম্পন্ন পরিবারের হাতে থাকে, সেটা জনগণের হাতে তুলে দেওয়া উচিত এবং তার সুষম বন্টনও অবশ্য করণীয়।

সামাজিক মঙ্গলের জন্য অধিগ্রহণের বিনিময়ে মালিকদের নায্য মূল্য পাবার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে, কিন্তু এই মূল্য দিতে হবে 'বণ্ডে'র মাধ্যমে (আমাদের শিক্ষক জেনারেল বাইও* একে বলতেন 'আশার বন্ধন', কেননা এ হল ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার মধ্যে এক সাধারণ স্বার্থের ব্যাপার।)

---

* জেনারেল আলবার্তো বাইও স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে অংশ নেওয়া এক প্রবীণ কিউবান। সিয়েররা মায়েস্ত্রায় গেরিলাযুদ্ধ শুরু করার জন্য যখন কিউবাতে ফিদেল কাস্ত্রোর বাহিনী ১৯৫৬-এর ডিসেম্বরে ফিরে আসে, তার আগে তিনি ফিদেলের বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দেন।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং বদমায়েস শত্রুদের জমি এবং সম্পত্তি চলে যায় বিপ্লবী বাহিনীর হাতে। এছাড়াও, যুদ্ধের উত্তাপের সুযোগ গ্রহণ করে, যখন মানবীয় ভ্রাতৃত্ব তার চূড়ান্ত গভীরতায় পৌঁছায়, সমস্ত ধরনের সমবায়মূলক কাজকর্মকে উজ্জীবিত করতে হবে, অবশ্যই স্থানীয় জনগণের মানসিকতাকে সম্মান করে।

সমাজ সংস্কারকরূপে গেরিলা যোদ্ধাদের শুধু যে নিজেদের জীবনকে উদাহরণস্বরূপ খাড়া করতে হবে তাই নয়, মতাদর্শগত বিষয়গুলির অভিমুখ নির্দেশ করতে হবে প্রতিনিয়ত, তারা কি জানে এবং সঠিক সময়ে তারা কি করতে চায় সেটা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে। যুদ্ধ চলাকালীন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যেভাবে তাদের বিপ্লবী সত্তা দৃঢ়তর হয়েছে সেটাকে তাদের কাজে লাগাতে হবে। অস্ত্রের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা আরও বেশি প্রগতিবাদী হয়েছে, কারণ তাদের নিজেদের জীবনে এবং প্রাণসত্তার অংশ হয়ে উঠেছে স্থানীয় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী। তারা অনুধাবন করে ন্যায় এবং বহুবিধ পরিবর্তনের অতীব প্রয়োজনীয়তা, যার পুঁথিগত গুরুত্ব হয়তো তারা আগেই বুঝেছিল, কিন্তু বোঝেনি ব্যবহারিক প্রয়োজনের আশু প্রয়োজনীয়তা।

প্রায়শই এটা ঘটে কারণ গেরিলাযুদ্ধের প্রণেতারা অথবা বলা যায় পরিচালকেরা দৈনন্দিন জীবনের চাপে সাধারণ মানুষের মত নুয়ে পড়ে না। তারা বোঝে কৃষকদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, যদিও সে নিজে ঐ ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার ভুক্তভোগী নয়। তখন যেটা হয় (এখানে, কিউবান অভিজ্ঞতার নিরীখে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি এবং তাকে আরও বিস্তারিত করছি) সেই সমস্ত নেতারা, যারা তাদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেয়, তাদের মধ্যে একটা সত্যিকারের পারস্পরিক মত বিনিময় হয়, আর অন্যদিকে জনগণও যারা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে, তারা নেতাদের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেয়। এইভাবে গেরিলাদের এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে একটা প্রগতিশীল চরমপন্থা গড়ে ওঠে যা আন্দোলনের বিপ্লবী সত্তাটাকে আরও গতিশীল করে এবং তাতে একটা জাতীয় চরিত্র আরোপ করে।

২. যুযুধান গেরিলা যোদ্ধা

সাধারণভাবে যেমনভাবে গেরিলা যোদ্ধার জীবন এবং কার্যক্রম চিত্রিত করা হয় তাতে কতকগুলি শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক গুণাবলী দাবি করা হয় যাতে তার প্রতি ন্যস্ত যে কোন কাজ সে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারে।

একজন গেরিলা যোদ্ধা কেমন হওয়া উচিত—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, তাকে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা হতে হবে। এই ক্ষেত্রে, তার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করবে এবং স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে এলাকাটাকে সে ভালভাবে চিনবে (অঞ্চল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানই হল গেরিলা যুদ্ধে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়), এবং যেহেতু স্থানীয় অঞ্চলের

বিশেষত্ব সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহাল, তাই কাজটাও করা যাবে ভাল করে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কাছের মানুষদের আত্মরক্ষার স্বার্থে আর এক সামাজিক ব্যবস্থাকে পাল্টিয়ে দেবার অঙ্গীকারে তার মধ্যে এক বিশেষ উদ্দীপনা কাজ করবে।

গেরিলা যোদ্ধার লড়াই নৈশকালীন, তাই এ ধরনের লড়াইয়ে তার বিশেষ পারদর্শিতা প্রয়োজন। গেরিলাকে হতে হবে ধূর্ত, দিকচিহ্নহীন সমতল অথবা পাহাড়ে লড়াইয়ে হঠাৎ করে আচম্বিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ নিতে হয় তাকে, যা এই ধরনের যুদ্ধে খুবই প্রয়োজনীয়। শত্রুর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, গেরিলা যোদ্ধা ঝাঁপিয়ে পড়বে যুদ্ধে, সঙ্গীসাথীর কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না, শত্রুর যে কোন দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য সে মুখিয়ে থাকবে। টর্নেডোর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকিছু ধ্বংস করতে হবে, কোনও ফাঁকফোকর রাখা চলবে না (যদি না বিশেষ পরিস্থিতিতে কৌশলগত কারণে কিছু দরকার হয়), যাদের বিচার করা দরকার তাদের বিচার করতে হবে, শত্রুসৈন্যর মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এসব সত্ত্বেও প্রতিরোধহীন বন্দীদের প্রতি গেরিলারা উদার ব্যবহারই করবে এবং মৃতকে সম্মান জানাবে।

একজন আহত শত্রুকে যথাযথ যত্ন ও শ্রদ্ধা করা উচিত, যদি না তার পূর্ব কৃতকর্মের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হয় ; সেরকম হলে তাকে অন্যান্যদের মতই দেখা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুদের কাছে অগম্য এমন জায়গায় নিরাপদ সুরক্ষিত স্থান নির্বাচন করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত বন্দিদের রাখার জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তা না হলে, বন্দিটি এলাকার সাধারণ মানুষ তো বটেই, গেরিলাদের কাছেও নিরাপত্তার দিক থেকে এক বিপদ হয়ে দেখা দেবে। কেননা শত্রুসৈন্যর কাছে সে সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে। সে যদি কোন কুখ্যাত অপরাধী না হয়, তাকে সাবধান করে মুক্তি দিয়ে দেওয়া উচিত।

যখনই দরকার হবে, গেরিলা যোদ্ধাদের তাদের জীবন বাজি রাখতে হবে, মৃত্যুবরণের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। একই সময়ে, তাদের অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং অনাবশ্যক লোকের চোখের সামনেও আসা চলবে না। পরাজয় বা ধ্বংস এড়াতে সমস্ত রকমের সতর্কতা নিতে হবে। এই কারণে প্রত্যেকটি যুদ্ধে একটা অবশ্যকরণীয় কাজ হল, সমস্ত সম্ভাব্য দিক থেকে শত্রুর বাহিনী আসার পথগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানো এবং যাতে গেরিলারা অবরুদ্ধ হয়ে না পড়ে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা। কারণ তেমন হলে শুধু যে শারীরিক ক্ষতি হবে তাই নয়, সংগ্রামের সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস হারানোর মত নৈতিক অবনমনের বিপদটাও থেকে যায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও, গেরিলা যোদ্ধাকে হতে হবে সাহসী। কোন অভিযানের আগে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে বিপদ এবং সম্ভাবনা। এমনকি প্রতিকূল এবং অনুকূল পরিস্থিতির বিশ্লেষণে যদি সবসময় আশার দিকটা নাও উঠে আসে, তবুও অনেক সময় একটা অনুকূল ফলাফলের আকাঙ্ক্ষায় তাকে পরিস্থিতির দিকে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঝাঁপাতেই হবে।

লড়াইয়ের এই পরিস্থিতি এবং শত্রু আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে টিকে থাকার জন্য

গেরিলাদের এমন একটা সম্পৃক্ত হবার ক্ষমতা থাকা দরকার যাতে তারা পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম বোধ করে, তার একটা অংশ হতে হবে এবং এই বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য সবটুকু সুযোগ নিতে হবে। গেরিলা যোদ্ধার আরও থাকা দরকার দ্রুত পরিস্থিতি অনুধাবন করার ক্ষমতা আর লড়াইয়ের মুহূর্তগুলোতে কৌশল পরিবর্তন করার সহজাত দক্ষতা।

এই মানিয়ে চলার এবং নব নব পন্থা উদ্ভাবনের গুণাবলীর কাছেই হার মানে যুদ্ধবাজদের সংখ্যাধিক্য এবং তারা অগ্রসর হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শত্রুর দয়ার উপর ফেলে রেখে কোন আহত সঙ্গীকে ত্যাগ করা উচিত নয় গেরিলা যোদ্ধার, কারণ এর অর্থ তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া। যে কোন মূল্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আহতকে। বিরাট উদ্যম এবং বড় ধরনের ঝুঁকি নিতেই হবে একাজে। তাই গেরিলা যোদ্ধাকে হতে হবে এক অসাধারণ বন্ধু।

একই সময়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে গেরিলাকে। শুধু নিজেদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে তাদের সব কথা এবং আলোচনা। একটাও বেফাঁস কথা বলা উচিত নয়, এমনকি একেবারে পাশের সহযোদ্ধার কাছেও, কারণ শত্রুরা সারাক্ষণ চেষ্টা করে যায় তাদের গুপ্তচরদের গেরিলা বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে, যাতে তাদের পরিকল্পনা, অবস্থান এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পর্কে খবর যোগাড় করা যায়।

নৈতিক গুণাবলী ছাড়াও গেরিলা যোদ্ধার থাকতে হবে প্রয়োজনীয় শারীরিক দক্ষতা। তাকে হতে হবে শ্রান্তিহীন, সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষিত হওয়ার মুখে তার চাই অতিরিক্ত এক কার্যক্ষমতা। গভীর আত্মপ্রত্যয় যা প্রতিফলিত হবে তার মুখের প্রতিটি পেশী সঞ্চালনে, নিয়ে যাবে গেরিলা যোদ্ধাকে পরবর্তী ধাপে; এবং সেটাই শেষ নয়, আরও আরও অনেক ধাপ পেরিয়ে যতক্ষণ না সে নেতৃত্বের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছতে পারছে।

চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবার ক্ষমতা থাকবে তার, শুধুমাত্র যে খাদ্য, জল, পোষাক এসবের ব্যাপারে তাই নয়, অসুস্থতা আর আঘাত সারানোর প্রাকৃতিক উপায়ের প্রতিই তাকে আস্থা রাখতে হবে, ডাক্তারী ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে। এটা এই কারণে যে, গেরিলা এলাকা ছেড়ে অসুস্থতা বা আঘাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বেরুলেই শত্রুপক্ষ তাকে খতম করার চেষ্টা করবে।

এইসব পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য গেরিলাযোদ্ধাদের থাকবে এক লৌহদৃঢ় সংবিধান, যাতে তারা সমস্তরকম প্রতিকূলতা প্রতিরোধ করতে পারে অসুস্থ না হয়ে, তাদের জীবনকে শক্তিশালী করতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে, গেরিলারা যেন লড়াইয়ের জায়গাটির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।

সবকিছু আলোচনার সমাহারে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে : একজন গেরিলা যোদ্ধার আদর্শ বয়স কত? এ ধরনের সীমারেখা নির্দিষ্টভাবে ঠিক করা খুবই কঠিন, কারণ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি সবসময়ই পৃথক। উদাহরণস্বরূপ গ্রামের একজন কৃষকের প্রতিরোধ ক্ষমতা একজন শহুরে ব্যক্তির চেয়ে ঢের বেশি, আবার একজন

শহরের অধিবাসী যে নিয়মিত ব্যায়াম করে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে তার ক্ষমতা যারা কেবলমাত্র চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করে তাদের চাইতে বেশি। কিন্তু সাধারণত গেরিলা লড়াইয়ের পুরোপুরি যাযাবার জীবনে একজন গেরিলা যোদ্ধার বয়স চল্লিশের বেশি হওয়া উচিত নয়, যদিও কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রও আছে, বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে। আমাদের সংগ্রামের অন্যতম বীর কম্যান্ডার ক্রেসসেনসিও পেরেস সিয়েররা মায়েস্ত্রায় আসেন ৬৫ বছর বয়সে, এবং অচিরেই তিনি হয়ে ওঠেন বাহিনীর একজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সদস্য।

আমরা এটাও জিজ্ঞাসা করতে পারি গেরিলা যোদ্ধাদের কি নেওয়া উচিত বিশেষ কোন সামাজিক শ্রেণী থেকে? এটা আগেই বলা হয়েছে বিশেষ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলের সামাজিক গঠনের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যবিধান করতে হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, গেরিলাবাহিনীর কেন্দ্র-স্থলটি গঠিত হবে কৃষকদের দ্বারা। স্বভাবতই কৃষকরাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, কিন্তু জনগোষ্ঠীর অন্যান্য অংশকে কোন মতেই ন্যায়ের জন্য লড়াইয়ের ইচ্ছা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত হবে না। কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম থাকবে।

এখনও পর্যন্ত আমরা সর্বনিম্ন বয়সের কোন সীমারেখা নিরূপণ করি নি। আমাদের বিশ্বাস ১৬ বছরের নীচে কোন নাবালককে গ্রহণ করা উচিত নয়, খুব বিশেষ ধরনের কিছু ক্ষেত্র ছাড়া। সাধারণ ভাবে এইসব অল্পবয়সীদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকে না, আবহাওয়া সম্পর্কে ও এবং কি ধরনের কষ্ট সহ্য করতে হবে সে সম্পর্কেও।

একজন গেরিলা যোদ্ধার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বয়স ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে, যে সময়টার মধ্যে বেশিরভাগ লোকের জীবনটা একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয়। সেই বয়সে যে মানুষটা সবকিছু পরিত্যাগ করে, বাড়িঘর, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বলতে গেলে সমগ্র চেনা জগত থেকে অনেক বড় এক দায়িত্ব পালনের তাগিদে এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, এক পা-ও পিছু না হটে। কিছু কিছু অসাধারণ উদাহরণ আছে কিশোরদের, যারা আমাদের বিদ্রোহী বাহিনীতে সর্বোচ্চ পদে পৌঁছে ছিল যোদ্ধা হিসাবে। কিন্তু এগুলো সাধারণ ব্যাপার নয়। ওদের মধ্যে দারুণ লড়াকু ছিল যারা, তাদের মধ্যে বেশ কিছু ছিল যাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত ছিল এবং প্রায়শই যারা গেরিলা বাহিনীর কাছে একটা বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমরা আগেই বলেছি, গেরিলারা হচ্ছে এমন ধরনের যোদ্ধা যারা শামুকের মত তাদের বাড়িটাকেই পিঠে বয়ে নিয়ে যায়। তাই প্রত্যেকের পিঠের ব্যাগটায় সবচেয়ে কম সংখ্যক বাসনপত্র থাকে যার থেকে সব চেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া যায়। যা অপরিহার্য শুধু সেটুকুই বয়ে নিয়ে যেতে হয়, সেইসব জিনিসগুলিকে এমনভাবে রক্ষা করতে হয় যাতে খোয়া না যায়, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসুবিধা ছাড়া।

একই কথা খাটে অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রেও। অস্ত্রের মধ্যে বুলেটগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার। সেগুলোকে শুকনো রাখা, সবসময় পরিস্কার রাখা, ভাল করে গুণে রাখা যাতে একটিও নষ্ট না হয়—এসব সম্পর্কে

হুঁশিয়ার থাকতে হয়। বন্দুকটাও পরিষ্কার রাখতে হবে, গ্রিস দিতে হবে, যাতে ব্যারেলটা চক্‌চক্‌ করে। প্রত্যেক দলের নেতাকে বলা উচিত যারা ঠিকমত অস্ত্রশস্ত্রের যত্ন না করবে, তাদের উপর হয় শাস্তি অথবা জরিমানা আরোপ করার।

এ ধরনের অসাধারণ প্রতিজ্ঞা এবং দৃঢ়তা যাদের থাকে তারা এমন একটা আদর্শে দীক্ষিত যা তাদের যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। আদর্শটা সরল, সোজাসাপটা বড় কিছু বহ্বাড়ম্বর নেই, কিন্তু এটা এত দৃঢ়, এত পরিষ্কার যে একজন মানুষ বিন্দুমাত্র দোদুল্যমানতা না দেখিয়ে এই আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়ে দেয়। বেশিরভাগ কৃষকদের কাছে আদর্শ হল এক টুকরো নিজের জমি থাকা যেখানে সে চাষ করতে পারে, কারণ এটাই তার কাছে সামাজিক ন্যায়। শ্রমিকের কাছে তা হল একটা কাজ থাকা, তার জন্য উপযুক্ত মজুরী পাওয়া যেটা তার কাছে সামাজিক ন্যায়স্বরূপ। ছাত্র এবং কর্মজীবীদের কাছে আদর্শ হচ্ছে 'মুক্তি'র ধারণা যেটা তাদের সংগ্রামের ইচ্ছার পিছনে একটা চালিকা শক্তি।

তাই প্রশ্ন ওঠে : গেরিলা যোদ্ধাদের জীবন কেমন? দৈনন্দিন জীবন হচ্ছে লম্বা পদযাত্রা, উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একজন পাহাড়ের গেরিলা যোদ্ধা, প্রতিনিয়ত শত্রুদের দ্বারা তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছে এক বন্য অঞ্চলে। এই রকম পরিস্থিতিতে গেরিলা দলটি দিনের বেলাতে এগিয়ে যেত তাদের অবস্থান বদলের জন্য, খাওয়াও জুটত না। রাত্রি নামলে নিয়ম করে জল পাওয়া যায়, এমন একটা জায়গায় তারা শিবির করত। প্রত্যেকটি দল একজায়গায় জড়ো হয় খাওয়ার জন্য ; সন্ধ্যা নামলে আশেপাশে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়।

যখন যেখানে যতটুকু পাওয়া যায় তাই খায় গেরিলা যোদ্ধারা। হঠাৎ কোনও সময় হয়তো দারুণ খাওয়া দাওয়া জুটে যায় তাদের ; অন্য সময়ে দু'দিন তিনদিন উপবাস করতে হয়, কিন্তু কাজের বোঝা হালকা না করে।


নাইলনের ছাদসহ দোলনা (হ্যামক)

বাড়ি তাদের খোলা আকাশের তলায়, আকাশ আর মাটির মাঝে একটা হ্যামক আর একটা ওয়াটারপ্রুফ নাইলনের চাদর, যার তলায় থাকে গেরিলা যোদ্ধার সব সম্পত্তি : তাদের ব্যাকপ্যাক, বন্দুক আর গোলাগুলি। এমন অনেক জায়গা থাকে যেখানে জুতো খোলার অবকাশ থাকে না, কেননা যখন তখন শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা। জুতো হল অন্যতম দামী সম্পত্তি। যার একজোড়া জুতো আছে, ঘটমান পরিস্থিতির মধ্যে সে বাড়তি নিরাপত্তা বোধ করে।

গেরিলা যোদ্ধাকে একজায়গায় অনেক দিন থাকতে হয়, পূর্ব নির্ধারিত ছাড়া সমস্ত যোগাযোগ এড়িয়ে চলে, রুক্ষতম অঞ্চলে থেকে, খিদের জ্বালা সহ্য করে, এক এক

সময় তৃষ্ণার জলটুকুও জোটে না, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আবার গরম, ক্রমাগত চলার সময় দরদর করে ঘাম ঝরে, ঘামটা শুকিয়ে যায় এক সময় কিন্তু পরের দিন আবার নতুন করে ঘর্মাক্ত হয়, অথচ দৈনন্দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কোন উপায় নেই (অবশ্য এটা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষে কি ব্যবস্থা করতে পারে তার উপর)।

সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় ক্রমাগত ১৬ কিমি. হাঁটার এবং প্রখর রৌদ্রের তলায় পৌনে তিন ঘন্টার এক ভয়ংকর যুদ্ধের পর এল উভেরো শহরে ঢোকা গেল যখন, (বেশ কয়েকদিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চড়া রোদের তলায় সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে থাকার পর) আমাদের শরীরগুলো থেকে এমন বিশ্রী গন্ধ বেরুতে লাগল যে কেউ আমাদের কাছে ঘেঁসতে পারত না। আমাদের নাক এ ধরনের গন্ধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। গেরিলা যোদ্ধাদের হ্যামকগুলোতেও একটা বিটকেল গন্ধ ছাড়ে, তার নিজস্ব ঘামের গন্ধ।

পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী শিবির ভেঙে ফেলার কাজটাও করতে হয় দ্রুততার সঙ্গে, পিছনে কোন চিহ্ন ফেলে না রেখে, চরম সতর্কতার সঙ্গে। প্রত্যেক ১০জন গেরিলা যখন ঘুমোবে, অন্তত এক থেকে দু'জন থাকবে পাহারায়, রক্ষী পরিবর্তন করতে হবে ক্রমাগত এবং শিবিরের ঢোকার পথে থাকবে কড়া নজরদারি।

ট্রেনিং জীবনে খাবার তৈরির ব্যাপারে বেশ কিছু কৌশল শেখানো হয়—কয়েকজন সাহায্য করে, খুব দ্রুত কিছু তৈরি করায়। অন্যরা শেখে জঙ্গলে যা সামান্য জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা যায়, অন্যরা গেরিলাদের খাদ্যতালিকাতে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবারের অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য নতুন নতুন পদ উদ্ভাবন করে— যার মধ্যে থাকে বিভিন্ন শিকড় বাকড়, শস্যদানা, লবণ, একটু তেল, আরও সবচেয়ে জরুরী হল জবাই করা কিছু জন্তুর মাংসের টুকরো। এই ইচ্ছে ট্রপিক্যাল অঞ্চলে লড়াইরত কোন দলের চিত্রপট।

যোদ্ধার জীবনের চালচিত্রে সবচেয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক ঘটনা, যা নিয়ে আসে জয়ের উন্মাদনা এবং যা প্রত্যেকের পদক্ষেপের ছন্দে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে, তা হল যুদ্ধ। গেরিলার জীবনে ক্লাইম্যাক্স হিসাবে যুদ্ধটা বেছে নেওয়া হয় সুবিধাজনক মুহূর্তে। হয় যখন কোন শত্রুশিবির খুঁজে পাওয়া যায় যা বেশ দুর্বল, যাকে সহজেই ধ্বংস করা যাবে, অথবা যখন মুক্তিবাহিনী দ্বারা ইতিমধ্যেই অধিকৃত কোন অঞ্চলের দিকে শত্রুবাহিনী সরাসরি এগিয়ে আসে। দুটি ক্ষেত্র কিন্তু আলাদা।

একটা শত্রুশিবিরের বিরুদ্ধে অভিযানটা হল একটা ছোটখাট অবরোধ, যা পর্যবসিত হয় সেই সমস্ত শত্রুসৈন্যদের ধরে ফেলার মধ্যে যারা সেই অবরোধ ভেঙে ফেলতে যায়। ফাঁদে পড়া শত্রু গেরিলাযোদ্ধার কাছে কখনই কাঙ্ক্ষিত শিকার নয়। সে চায় মানসিক ভাবে দুর্বল, জায়গাটি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, সবকিছু থেকে ভীত এবং প্রতিরক্ষার জন্য ন্যূনতম উপকরণহীন অবস্থায় শত্রুটি যেন চলে যেতে পারে। কিন্তু একটা বড় শত্রুসৈন্যদল যাদের শক্তিশালী অস্ত্র আছে, সেক্ষেত্রে অবস্থাটা একরকম নয়। একটা লম্বা বাহিনীকে হঠাৎ আক্রমণ করে দু'তিন জায়গায় বিভক্ত করে দেওয়া যায়। যদি

আক্রমণকারীরা সৈন্যদলটিকে অবরুদ্ধ করে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে প্রতি আক্রমণের আগেই পিছু হটে আসা উচিত।

শত্রুশিবিরের ভিতরে অবরুদ্ধ সৈন্যদের যদি খিদে তৃষ্ণা বা সরাসরি আঘাতের মাধ্যমে পরাজিত করার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে ধ্বংসাত্মক কাজ ফলপ্রসু হওয়ার পরে গেরিলাবাহিনীর সেখান থেকে ঝটিতি সরে যাওয়াই ভাল। যেসব ক্ষেত্রে গেরিলারা খুবই দুর্বল এবং আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী অনেক শক্তিধর, সেখানে আক্রমণটা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত শত্রুদের অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর। একটা বিশেষ ধরনের কৌশল নিতে হয় এ সব ক্ষেত্রে। ফলাফল যা কিছু হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি না রেখে, অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে বারবার হামলা চালানোর পরে। একটা কথা শত্রুদের মধ্যে চাউর করে দিতে হয় যে, সামনের দিকের সৈন্যরা ক্রমাগত মারা যাচ্ছে, এবং এই জায়গাটা এখনও না ছাড়ার গোঁ ধরে থাকলে, সেটা হবে একধরনের বিদ্রোহ। তাই, আক্রমণটা ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে অন্যান্য অংশেও।

কেমন ধরনের জিনিসপত্র তার কাছে আছে, তার ওপর নির্ভর করে গেরিলাযোদ্ধার কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার প্রবণতা। যদিও তারা থাকে ছোট ছোট দলের অন্তর্ভুক্ত এক সদস্য হিসাবে, তবুও তার থাকতে পারে কিছু ব্যক্তিগত প্রয়োজন। তাদের নিয়মিত আশ্রয় ছাড়া, তাদের পিঠের ব্যাগে সবসময় রাখতে হবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু, কারণ কখনও কখনও তাদের দলছুট হয়ে হয়তো কিছুদিনের জন্য একাও কাটাতে হতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে কোন একজনের বহনযোগ্য জিনিষের তালিকা করতে গিয়ে আমরা দেখব একটা রুক্ষ দেশে যুদ্ধের শুরুতে, যেখানে যখন তখন বৃষ্টিপাত হয়, বেশ ঠাণ্ডা আবহাওয়া আর আছে শত্রুদের হাতে তাড়া খাওয়া, সেখানে কি কি লাগে। অন্যকথায় বলতে গেলে, ঠিক যে ধরনের পরিস্থিতির আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম কিউবার মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে।

গেরিলা যোদ্ধার যেসব জিনিসপত্র দরকার তাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়—একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় আর একটা বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র। প্রথমটার মধ্যে এক নম্বরে থাকবে একটা হ্যামক। এটা দেবে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম। ওটাকে ঝোলানোর জন্য দুটো গাছ ঠিকই খুঁজে পাওয়া যাবে। যদি কেউ মাটিতে শুয়ে ঘুমোয় এটা গদি হিসাবে কাজ করবে। ট্রপিক্যাল পাহাড়ী এলাকায় যা প্রায়শ হয়ে থাকে, অর্থাৎ বৃষ্টি অথবা মাটি ভিজে থাকা, সেখানে হ্যামক একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এক টুকরো ওয়াটারপ্রুফ নাইলন একে রক্ষা করে। নাইলনটা তার কোনা থেকে ঝোলানো হ্যামকটা থেকে বেশ বড় হতে হবে আর যে গাছ দুটো থেকে হ্যামকটা ঝোলানো হবে সেগুলো থেকেই নাইলনটাকেও ঠিক মাঝ বরাবর ঝোলাতে হবে যাতে এটি একটি তাঁবুর মত ব্যবহার করা যায়।

পাহাড়ে রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে তাই একটা কম্বল অপরিহার্য, চরম তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য জামাকাপড়, যেমন জ্যাকেট দরকার। কঠোর

কাজ করার জন্য উপযোগী প্যান্ট আর শার্ট থাকতে হবে। তা ইউনিফর্ম হতে পারে, নাও পারে। যেহেতু ভাল জুতো ছাড়া লম্বা হাঁটা অসম্ভব তাই যতদূর সম্ভব উপযোগী জুতো থাকা দরকার আর এই জিনিসটা রিজার্ভ-এ রাখার জন্য তালিকার প্রথমে থাকা জরুরী।

যেহেতু তাদের পিঠের ব্যাগে প্রায় পুরো বাড়িটাকেই বয়ে নিয়ে বেড়ায় গেরিলারা, তাই শেষের জিনিসটা খুব প্রয়োজনীয়। সবচেয়ে আদিম ধরনের কিছু তৈরি করা যায় এক ধরনের চট, তার সঙ্গে দুটো দড়ি দিয়ে। কিন্তু বাজারে মেলে এমন ক্যানভাসের কাপড়ই উপযোগী। দলের জন্য যা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার বাইরেও গেরিলাযোদ্ধার সংগ্রহে কিছু ব্যক্তিগত খাবার জিনিস থাকা উচিত। অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হল : তেল, টিনজাত খাবার যেগুলি প্রয়োজন যখন রান্নার জন্য খাবার অমিল। যখন অনেক টিনের বোঝার ফলে হাঁটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন পুষ্টিকর খাবারের জন্য সংরক্ষিত মাছ, জমানো দুধ (যার ভিতরে আছে ভালো পরিমাণ চিনি), পাউডার দুধ যা সহজেই বহন করা যায়। এ ছাড়া চিনি আর লবণ যা ছাড়া জীবন প্রায় মরুভূমি হয়ে যায় আর খাবারের পরিপূরক হিসাবে পেঁয়াজ, রসুন, যা স্থানীয়ভাবে মেলে এমন জিনিস তালিকায় রাখা উচিত।

গেরিলা যোদ্ধার আরও উচিত একটা প্লেট, ছুরি আর কাঁটা নিয়ে যাওয়া যা বিভিন্ন কাজে লাগে। আর একটা পাত্র যাতে যে কোন খাবার, তা মাংস, মালাঙ্গা*, আলু রান্না করা যায় অথবা চা কফি বানানোও যেতে পারে।

রাইফেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'গ্রিজ' খুব দরকারি। যত্ন সহকারে ওটি রাখতে হবে। যদি বিশেষ ধরনের তেল না পাওয়া যায়, তবে সেলাই মেসিনের তেল দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে। কিছু কাপড় আর একটা রড দরকার বন্দুকের ভিতরটা পরিষ্কার রাখার জন্য, প্রতিনিয়তই তা করতে হয়। গোলাগুলি রাখার জন্য বেল্টটা হাতে তৈরিও হতে পারে, বাণিজ্যিকভাবে তৈরিও হতে পারে, কিন্তু এটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে একটা গুলিও নষ্ট না হয়। বুলেট বা গুলিই হচ্ছে যুদ্ধের চাবিকাঠি যা ছাড়া সবকিছুই অর্থহীন, তাই সোনার মত দামি বস্তু হিসাবে একে রক্ষা করতে হবে।

এক বোতল জল তো বিশেষ প্রয়োজনীয়, যখন জল অলভ্য হয়ে পড়বে তখন এর দরকার হবেই। সাধারণভাবে যেসব ঔষধ দরকার হয়, সেগুলোও সঙ্গে রাখতে হবে যেমন, পেনিসিলিন অথবা অন্য কিছু ধরনের অ্যান্টিব্যায়েটিক, যেসব ঔষধ গিলে ফেলা যায়। এছাড়াও অ্যাসপিরিন জাতীয় জ্বরের ট্যাবলেট। সেই এলাকার কোন বিশেষ রোগের প্রতিষেধক যার মধ্যে আছে ম্যালেরিয়া, আমাশা, এক কথায় ঐ অঞ্চলে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক। যেখানে বিষধর জীব বা পোকামাকড় থাকে তার জন্য সঠিক প্রতিষেধক নেওয়াটা দরকার। সারজিক্যাল যন্ত্রপাতি সমস্ত প্রয়োজনের

* মালাঙ্গা হচ্ছে কিউবা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এক ধরণের স্টার্চ শিকড়সহ সব্জি।

শেষ কথা। তাই ছোটখাট চোট আঘাতের জন্য কিছু জিনিস প্রত্যেকের ব্যাগেই থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণভাবে গেরিলা যোদ্ধাদের জীবনে একটু আরামের ছোঁয়া এনে দেয় ধূমপান যেমন সিগার, সিগারেট বা তামাকের পাইপ। বিশ্রামের মুহূর্তে নিঃসঙ্গ যোদ্ধার কাছে ধূমপান হল এক প্রিয় বন্ধুস্বরূপ। সবচেয়ে কাজে লাগে পাইপ, কারণ তামাকের শেষ গুঁড়োটা পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, বিশেষ করে অভাবের সময়ে। দেশলাই হচ্ছে ভীষণ দরকারি জিনিস, কেবলমাত্র সিগারেট ধরানোর জন্য নয়, আগুন জ্বালানোর জন্যই। বর্ষার সময় জঙ্গলে এক বিরাট সমস্যা। তাই দেশলাই এবং একটা লাইটার দুটো রাখাই জরুরী। যদি লাইটারের জ্বালানি শেষ হয়ে যায়, বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারে দেশলাই।

সাবান সঙ্গে নিতেই হবে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কথা ভেবে নয়, খাবার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র পরিষ্কার করার জন্যও ; কারণ পেটের গণ্ডগোল প্রায়শই ঘটে থাকে যার উৎস নোংরা বাসনপত্র, পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট থেকে। এইসব জিনিসপত্র সঙ্গে থাকলে, অন্তত আশ্বস্ত হওয়া যায় যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও জঙ্গলে গেরিলা যোদ্ধা জীবন কাটাতে পারে, অন্তত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে যতদূর সম্ভব।

সহায়ক যন্ত্রপাতিগুলি কখনও কখনও খুব প্রয়োজনীয়, কতকগুলো অবশ্য বোঝার মত, তবুও প্রয়োজনে লাগে। কম্পাস হল এরকমই একটা জিনিস, প্রথমদিকে দিক নির্ণয়ের কাজে খুব ব্যবহার করা হয় এটি, কিন্তু আস্তে আস্তে এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান গাঢ় হলে এর আর তেমন প্রয়োজন থাকে না। পাহাড়ি অঞ্চলে কম্পাসের তেমন ব্যবহার নেই, কারণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধাগুলো নির্দেশিত পথকে মাঝপথেই কেটে দেয়। আর একটা প্রয়োজনীয় জিনিস হল একটা অতিরিক্ত নাইলন কাপড় যা দিয়ে বৃষ্টির সময়ে সমস্ত জিনিসপত্রগুলোকে ঢাকা যায়। মনে রাখা দরকার যে, ট্রপিক্যাল দেশগুলোতে কয়েকটি মাসে নিরবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি হয়, এবং জল হচ্ছে গেরিলারা যা কিছু বয়ে নিয়ে যায় অর্থাৎ খাবার, গোলাগুলি, ঔষধ, কাগজ এবং জামাকাপড়—এসবের ঘোরতর শত্রু।

জামাকাপড় পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত একজোড়া প্যান্টের বেশি আর কিছু বহন করা উচিত নয়। অন্তর্বাস, তোয়ালের মত জিনিস না নেওয়াই ভাল। অভিজ্ঞতা থেকে গেরিলা যোদ্ধা শেখে কেমন করে ব্যাকপ্যাকটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যেতে হয়, তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হয় এবং আস্তে আস্তে সেই সমস্ত জিনিসের থেকে রেহাই পাওয়া যায়, যার কোন দামই নেই।

স্বাস্থ্যরক্ষার এবং বাসনপত্র ধোওয়ার প্রয়োজনে এক টুকরো সাবান ছাড়া একটা টুথব্রাশ এবং টুথপেস্ট নেওয়া জরুরী। একটা বইও সঙ্গে রাখা উচিত, যা দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে বিনিময় করা যায়। বইগুলির বিষয় হতে পারে অতীতের বীরদের জীবনী, ইতিহাস অথবা অর্থনৈতিক ভূগোল, অবশ্যই তার স্বদেশের এবং সাধারণ চরিত্রের রচনা যা সৈন্যদের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করে ও জুয়াখেলা বা অন্যান্য বাজেভাবে অবসর সময় কাটানোর ইচ্ছা্কে দমন করে। গেরিলা যোদ্ধার জীবনে মাঝে মাঝে একঘেঁয়েমি চেপে বসে।

ব্যাকপ্যাকে যদি কোন খালি জায়গা থাকে, সেটাকে ব্যবহার করা উচিত খাবারের জন্য, অবশ্য যেসব অঞ্চলে খাবার সহজলভ্য সেখানে অন্য কথা। মিষ্টি অথবা যেসব খাবার মৌলিক উপাদানগুলির পরিপূরক তেমন জিনিসই বহন করা উচিত। মুচমুচে বিস্কুট এমনই একটা জিনিস, যদিও তা অনেকটা জায়গা নিয়ে নেয় এবং ভেঙে টুকরো টুকরোও হয়ে যায়। ঘন জঙ্গলে একটা বড় ছুরি খুব দরকার। খুব ভিজে জায়গায় একটা ছোট পেট্রোলের বোতল অথবা আগুন জ্বালানোর জন্য ধুনো জাতীয় কাঠের দরকার। কাঠ ভিজে থাকলে আগুন জ্বালাতে এগুলি সাহায্য করবে।

একটা ছোট নোটবুক, তার সঙ্গে পেন বা পেন্সিল বাইরের জগতে চিঠিপত্র লেখার জন্য বা অন্যান্য গেরিলাদলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে, অবশ্যই সঙ্গে নেওয়া দরকার। তার বা দড়ির টুকরোও থাকা দরকার। কতভাবে তার দরকার হতে পারে। সঙ্গে সূচ, সুতো, বোতাম জামাকাপড়ের জন্য। যে গেরিলা যোদ্ধার পিঠে এই ধরনের বোঝা থাকবে, একটা বেশ শক্তপোক্ত বাড়ির মত, বন্ধুর চলার পথে সে আপাত আরামদায়ক একটা জীবন খুঁজে পাবে, যদিও বোঝাটা মনে হবে বেশ ভারি।

৩. গেরিলা দলের সংগঠন

কোন ধরাবাঁধা রূপরেখা নেই গেরিলা দল সংগঠনের। যে পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় তার উপরে নির্ভর করে অগুনতি পার্থক্য। যুক্তির খাতিরে আমরা মনে করতে পারি যে, আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে একটা বিশ্বজনীন প্রয়োগ, কিন্তু সব সময় এটা মনে রাখা দরকার যে একটি সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সম্ভবত নতুন কোন ধরনের সংগঠন প্রয়োজন।

আর একটা কঠিন সমস্যা গেরিলাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের আয়তন (size) নিয়ে। বাহিনীগুলির সংখ্যা এবং গঠনে পার্থক্য থাকে। মনে করা যাক, একটি বাহিনী আছে অনুকূল পার্বত্য অঞ্চলে, এমন খারাপ অবস্থায় নয় যে প্রতিনিয়ত আক্রমণ প্রতিবছর করতে হচ্ছে, আবার এত ভাঙ্গা অবস্থাও নয় যে, আক্রমণের জন্য ঘাঁটি গড়ে তোলা গেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর গেরিলা যোদ্ধার সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি হওয়া উচিত নয়। এই সংখ্যাটাও বরং বেশি, হওয়া উচিত ১০০-র কাছাকাছি। এদের নিয়ে একজন কোমানদান্তের নেতৃত্বে একটা কলাম গঠন করতে হবে; এটা কিউবান সংগঠনের ধারা অনুযায়ী। মনে রাখতে হবে, আমাদের যুদ্ধে আমরা 'করপোরাল' ও 'সার্জেন্ট' পদ দুটি বিলোপ করে দিয়েছিলাম, তার কারণ সেগুলি একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে সমোচ্চারিত।*

এই ভিত্তিতে কোমানদান্তে নেতৃত্ব দেন এই ১০০ থেকে ১৫০ জন গেরিলার

* ফুলহেনসিও বাতিস্তা, ১৯৩৩ সালে প্রথম 'সার্জেন্টদের বিদ্রোহে'র মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে।

বাহিনীকে, প্রতি ৩০ থেকে ৪০ জনের জন্য থাকে একজন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনের ভূমিকা হচ্ছে তাদের প্লাটুনকে নির্দেশ দেওয়া এবং একতাবদ্ধ করা, তারা যাতে একটি ইউনিট হিসাবে লড়াই করে তা দেখা, গেরিলাদের সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং সাধারণ সংগঠন। গেরিলা যুদ্ধে, স্কোয়াড হচ্ছে কার্যকরী ইউনিট। এক একটি স্কোয়াড গঠিত হয় ৮ থেকে ১২ জন যোদ্ধা নিয়ে, নেতৃত্ব দেয় একজন লেফটেন্যান্ট, সে প্লাটুনের ক্যাপটেনের মতই নেতৃত্ব দেয়, কিন্তু সবসময়েই থাকে ক্যাপটেনের অধীনে।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে লড়াই করার প্রবণতা থেকে স্কোয়াডগুলি সত্যিকারের ইউনিট হিসাবে গড়ে ওঠে। খুব বেশি হলে ৮ থেকে ১০ জন গেরিলা যুদ্ধে কাজ করে সংঘবদ্ধভাবে, একই ফ্রন্টে লড়াই চালালেও তারা অনেক সময়ই বিচ্ছিন্ন থাকে ক্যাপ্টেনের থেকে, লড়াই করে লেফটেন্যান্টের নেতৃত্বে ; ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যখন লড়াই থাকে না, তখনও কোন স্কোয়াডকে ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক স্কোয়াড এবং প্লাটুনের সদস্যদের জানা থাকা উচিত নেতা নিহত হলে কে হবে তার উত্তরাধিকারী এবং এরকম এক যোদ্ধাকে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যাতে সে তৎক্ষণাৎ তার নতুন দায়িত্ব পালন করতে পারে।

বাহিনীর একটা মৌলিক সমস্যা হল খাদ্য সরবরাহ, এ ব্যাপারে একেবারে শেষের সারির লোকটির সঙ্গে বাহিনীর প্রধানকে একই চোখে দেখতে হবে। এর একটা বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে, কেবলমাত্র প্রতিনিয়ত খাদ্যের পরিমাণ কম থাকে বলেই নয়, উপরন্তু এটা একটা প্রাত্যহিক ঘটনা প্রত্যেকের জীবনে। বাহিনীর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, তাই তাদের প্রত্যেকের রেশন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিমাপ করা হয়, কারও প্রতি ন্যূনতম পক্ষপাতিত্ব অপরাধের সামিল। যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সমগ্র কলামকে খাবার পরিবেশন করা হয়, একটা নির্দিষ্ট নিয়ম জারি করে সেটা কঠোরভাবে পালন করতে হবে। একই সময়ে প্রত্যেককে দেওয়া খাবারের পরিমাণ এবং গুণাগুণ ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার। কাপড়জামা বন্টনের ক্ষেত্রে সমস্যাটা অন্যরকমের কারণ এগুলি ব্যক্তিগত ব্যবহারের বিষয়। এক্ষেত্রে দু'ধরনের বিচার হতে পারে : প্রথম, প্রয়োজনের চাহিদা যেটা সব সময় সরবরাহের চেয়ে বেশি এবং দ্বিতীয়, প্রত্যেক আবেদনকারীর দলে কাজ করার সময় এবং তার ব্যক্তিগত দক্ষতা। এ দুটোই নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে। কলামের নেতার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে সবার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য কোন বিশেষ বইয়ে নথিবদ্ধ করে রাখার জন্য। এই ঘটনা ঘটে অন্য যা কিছু জিনিস পাওয়া যায় তার বন্টনের জন্য, যেগুলি সমষ্টিগত ব্যবহারের জন্য নয়। বরং দরকার ব্যক্তি মানুষের। তামাক এবং সিগারেটের ক্ষেত্রে সবার প্রতি সমান ব্যবহার এই সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে বন্টন ব্যবস্থায় থাকা উচিত।

বন্টনের দায়িত্বটা নির্দিষ্টভাবে কারো হাতে অর্পণ করতে হবে। এমন লোকেদের হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া শ্রেয় যারা নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। নেতৃত্ব তাই যোগাযোগ

রক্ষার প্রশাসনিক গুরু দায়িত্ব পালন করবে, তার সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য বিশেষ কাজ। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা আছে এমন অফিসারদের নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। আর নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত সৈন্যদের হতে হবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, কারণ তারা অবশিষ্ট বাহিনীর থেকে অনেক বেশি দায়িত্বের বোঝা বহন করবে। এসব সত্ত্বেও, খাবার সময়ে তাদের কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না।

তাদের যাবতীয় সামগ্রী নিজেরাই বহন করবে গেরিলাযোদ্ধারা। এছাড়াও সর্বসাধারণের প্রয়োজনে কিছু জিনিস বইতে হবে যা সবাইয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। এ জন্যও একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া দরকার। যা নির্ভর করবে বাহিনীতে কতজন নিরস্ত্র লোক আছে তার উপর। একটা পদ্ধতি হল সমস্ত ধরনের অতিরিক্ত বস্তু, যেমন, ঔষধপত্র, ডাক্তারী, দাঁত এবং শল্যবিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত খাবার, জামাকাপড়, সাধারণ সরবরাহ এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র, এসব প্লাটুনের ভিতর সমভাবে বন্টন করে দিতে হবে, যারা তার নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। প্রত্যেক ক্যাপটেন এই সমস্ত জিনিস দেখে স্কোয়াডগুলিকে এবং স্কোয়াডের প্রধানরা সেগুলি ভাগ করে দেবে গেরিলাদের হাতে। যখন পুরো বাহিনীর সকলেই সশস্ত্র থাকে না, তখন অন্য একটা সমাধান আছে ; তা হল পরিবহনের জন্য একটা বিশেষ স্কোয়াড বা প্লাটুনের হাতে দায়িত্ব দেওয়া। এটা খুব ভাল কাজ দেয় কারণ যে সমস্ত সৈন্যদের তাদের রাইফেলের জন্য ইতিমধ্যেই একটা অতিরিক্ত বোঝা বইতে হচ্ছে, তারা একটু রেহাই পায়। একই সঙ্গে মাল বহনকারীদের মধ্যে এটা একটা অতিরিক্ত উৎসাহের সৃষ্টি করে, কে কতটা পরিমান এবং কত ভালভাবে জিনিসপত্র বইতে পারছে তার নিরিখে। এটাই তাকে ভবিষ্যতে একটা অস্ত্রের অধিকারী হবার পথে এক পা এগিয়ে দেবে। এই প্লাটুনগুলি চলবে পুরো বাহিনীর পিছনে এবং বাহিনীর অন্য সকলের মত তাদেরও একই দায়িত্ব থাকবে এবং ব্যবহারও পাবে সবার মত একইভাবে।

একটা কলামকে কি দায়িত্ব পালন করতে হবে তা নির্ভর করে তার কাজকর্মের ধরনের ওপর। যখন শিবির করে থাকা হয়, বিশেষ দল থাকবে নজরদারির জন্য। এই দলের সদস্যদের হতে হবে অভিজ্ঞ, বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এবং তাদের এই দায়িত্বের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। হতে পারে কিছুটা বাড়তি স্বাধীনতা, অথবা মিষ্টি বা তামাক দলের সকলের মধ্যে সমানুপাতিক বন্টনের পরে কিছু উদ্বৃত্ত এই পাহারাদার দলের সদস্যদের দেওয়া হল। উদাহরণস্বরূপ যদি সব গেরিলার জন্য ১১৫ প্যাকেট সিগারেট বিলিবন্দোবস্ত করতে হয় তাহলে উদ্বৃত্ত ১৫টা প্যাকেট এই ইউনিটগুলির সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদভাগ সামলানোর দায়িত্বে থাকা ইউনিটগুলির বিশেষ নজরদারির দায়িত্ব থাকবে ; কিন্তু প্রত্যেক প্লাটুনের আবার নিজস্ব রক্ষী থাকবে। শিবির থেকে যতদূর নজরদারির ব্যবস্থা হবে, সেইমত তাদের নিরাপত্তাও বাড়বে, বিশেষ করে যখন তা থাকে খোলা জায়গায়।

জায়গাগুলো পছন্দ করতে হবে উঁচুতে, যাতে দিনের আলোতে পুরো জায়গাটা ভালভাবে দেখা যায় এবং রাত্রিতে জায়গাটা অগম্য হয়। যদি বেশ কিছুদিন থাকার

পরিকল্পনা থাকে, এমনভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে যে কোন আক্রমণের সময় শত্রুর ক্রমাগত গুলিবর্ষণের মোকাবিলা করা যায়। এই সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে হয় গেরিলা দল যখন অন্যত্র চলে যায় অথবা যদি এমন পরিস্থিতি থাকে যে কলামের পদচিহ্ন গোপন করার আর কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে নষ্ট না করলেও চলে।

যেখানে স্থায়ী শিবির স্থাপন করা হয়, যেখানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা ক্রমশ উন্নত করা উচিত। মনে রাখা উচিত, নিজেদের পছন্দমত পাহাড়ী জায়গায়, ভারী অস্ত্র বলতে মর্টারই সবচেয়ে উপযোগী। স্থানীয় সহজলভ্য জিনিস যেমন, কাঠ, পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করার ছাদের আড়ালে আশ্রয় তৈরি করে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে, মর্টার শেল থেকে প্রতিরক্ষাও পাওয়া যায়।

শিবিরে শৃঙ্খলা রক্ষা করাটা ভীষণ জরুরী এবং এর একটা শিক্ষাগত দিক আছে। গেরিলা যোদ্ধাদের নির্দিষ্ট সময়ে সকালে উঠতে হবে, রাতে ঘুমাতেও যেতে হবে। সামাজিক দিক থেকে যার কোন প্রভাব নেই এবং দলের নীতিবোধকে যা ক্ষতি করবে এমন খেলাধূলো পরিত্যাজ্য, তার সঙ্গে অ্যালকোহল সেবন তো বটেই। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবে একটি কমিশন, যা নির্বাচিত হবে বিপ্লবী কর্মকুশলতার শীর্ষে থাকবেন এমন সব যোদ্ধাদের নিয়ে। তাদের আরও একটা ভূমিকা থাকবে যাতে তারা দৃশ্যমান হয় এমন জায়গায় আলো জ্বালানো না হয় অথবা রাত্রি নামার আগেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী না ওঠে। শিবির যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং যখন পুরো দলটি জায়গাটি ছেড়ে যাবে তখন যাতে কোন চিহ্ন না পড়ে থাকে সেদিকেও তারা লক্ষ্য রাখবে।

সবচেয়ে বেশি সতর্কতা নেওয়া উচিত আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে, কারণ আগুনের চিহ্ন বহুক্ষণ পড়ে থাকে। সবসময়েই এমন চিহ্নকে মাটি চাপা দেওয়া দরকার। কাগজ, টিনের বাক্স, খাবারের উচ্ছিষ্ট—সবই পুড়িয়ে ফেলা দরকার। মার্চের সময় পূর্ণ নীরবতা পালন করা উচিত। অঙ্গভঙ্গী বা ফিসফিসিয়ে কথা বলে নির্দেশ পাঠানো হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শেষ ব্যক্তিটির কানে পৌঁছচ্ছে। কোন অজানা জায়গার মধ্য দিয়ে রাস্তা কেটে অথবা কোন পথপ্রদর্শকের সাহায্য নিয়ে যদি গেরিলা দল পথ চলে, তাহলে অগ্রগামী বাহিনী ১০০ থেকে ১৫০ মিটার আগে থাকবে, অবশ্যই জায়গাটির চরিত্র অনুযায়ী। যেখানে পথ সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহ দানা বাঁধবে, সেখানে প্রত্যেক বাঁকে একজন করে গেরিলাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে পিছনের লোকেদের জন্য, এটা বারবার করা হবে যতক্ষণ না একেবারে শেষের যোদ্ধাটি পথটি অতিক্রম করবে। একেবারে পিছনের বাহিনীটি অবশিষ্ট বাহিনীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে, পিছনের রাস্তায় নজর রাখবে এবং যতদূর সম্ভব তাদের চলার পথের চিহ্ন মুছে ফেলবে। যদি পাশে কোন রাস্তা থাকে যেদিক থেকে বিপদ আসতে পারে, তাহলে সেদিকেও একটি দল নজর রাখবে যাতে সবাই নিরাপদে পেরিয়ে যায়। কার্যক্ষেত্রে সুবিধা হয় যদি প্রত্যেক প্লাটুনের নিজস্ব দল থাকে এই কাজের জন্য এবং অনুসারী প্লাটুনকে দায়িত্ব

বুঝিয়ে দিয়ে আবার নিজেদের দলে যোগ দেয় ; এই পদ্ধতিটি চলতেই থাকবে পুরো বাহিনী পার না হওয়া পর্যন্ত।

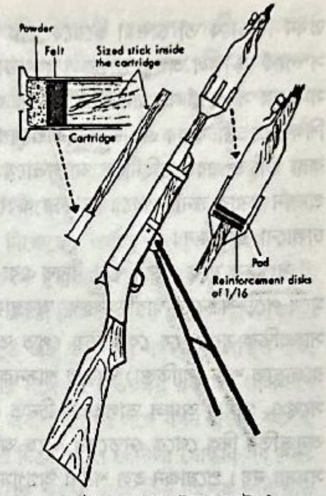
পথ চলাটা একইভাবে এবং নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা মেনে হবে। এটা সকলের জানা থাকবে যে এক নম্বর প্লাটুন হল অগ্রগামী অংশ, তারপরে দুই নম্বর, তিন নম্বর হতে পারে নেতৃত্বে, তারপরে চার নম্বর, পরপর শেষতম অংশ অথবা প্লাটুন নম্বর পাঁচ। রাত্রিকালীন মার্চের সময় কঠোরভাবে পালন করা হবে নীরবতা আর যোদ্ধাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্বটা কমিয়ে আনতে হবে, যাতে কেউ না হারিয়ে যায়। দরকার হলে যাতে তারা চিৎকার করতে পারে অথবা কোন আলো দেখাতে পারে। গেরিলা যোদ্ধার কাছে রাত্রিতে আলো হল একপ্রকার শত্রু।

যদি কোন মার্চ করা হয় আক্রমণের উদ্দেশ্যে, তাহলে এমন একটি জায়গা যেখানে কাঙ্খিত লক্ষ্য সফল হলে ফিরে আসবে সকলে, সেখানে পৌঁছে সমস্ত অতিরিক্ত ওজন যেমন পিঠের ব্যাগ এবং রান্নার বাসনপত্র ছেড়ে রেখে প্রত্যেক প্লাটুন কেবলমাত্র অস্ত্র এবং লড়াইয়ের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে অগ্রসর হবে। বিশ্বাসী লোকজনেরা যারা জায়গাটা ভালভাবে পরিদর্শন করেছে এবং শত্রুদের রক্ষীঘাঁটির অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করেছে, তারা আক্রমণের কেন্দ্রটা পর্যালোচনা করবে। নেতারা, ঘাঁটির অবস্থা, কতজন লোক প্রতিরক্ষায় আছে ইত্যাদি ভাল করে জেনে আক্রমণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা করবে এবং যোদ্ধাদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাঠাবে ; সব সময় মনে রাখতে হবে যে, বেশ কিছু সংখ্যক যোদ্ধাকে নিয়োজিত রাখতে হবে শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থাকে কেটে দেবার জন্য। যদি কোন ক্ষেত্রে আক্রমণের উদ্দেশ্য হয় কেবল শত্রুদের সরবরাহ লাইনটিকে কেটে দেওয়া, তাহলে কারও উচিত নেতৃত্বকে আক্রমণের ফলাফল তৎক্ষণাৎ অবহিত করা, যাতে অবরোধটা ভেঙে দেওয়া যায় যদি দরকার হয় ; তাহলে পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটাকেও প্রতিহত করা যায়। যে কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাওয়ার রাস্তাগুলিতে রক্ষী নিয়োগ করতে হবে, যখন অবরোধ ভাঙা অথবা সরাসরি আক্রমণ সংঘটিত হবে।

সব সময় রাত্রিতে সরাসরি আক্রমণ করা শ্রেয়। যদি যথেষ্ট পরিমাণে চালিকাশক্তি, প্রয়োজনীয় উপস্থিত বুদ্ধি এবং অতিরিক্ত ঝুঁকি না থাকে, তাহলে শত্রুশিবির দখল করা সম্ভব।

শত্রুশিবির অবরোধের জন্য বিশেষভাবে দরকার অপেক্ষা, নিজেদের আড়াল করা, ধীর-স্থিরভাবে শত্রুর কাছাকাছি হওয়া, বিভিন্ন উপায়ে তাকে নাজেহাল করা। সবার উপরে গুলিবর্ষণের দ্বারা তাকে টেনে বাইরে আনা। যখন বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসবে, 'মলোটভ ককটেল' হচ্ছে একটা অসাধারণ কার্যকরী অস্ত্র। 'ককটেল'-এর আওতায় আসার আগে শটগানের সাহায্যে আক্রমণ করা যেতে পারে। এইসব অস্ত্রগুলো যাদের আমাদের যুদ্ধের পোষাকী নাম ছিল 'এম-১৬' সেগুলি ছিল ১৬ ক্যালিবারের করাতে কাটা শটগান, একজোড়া পায়ার সঙ্গে বন্দুকের বাঁটটা লাগিয়ে যার নিচে একটা

তেপায়া তৈরি করা হত। এইভাবে অস্ত্রটাকে উঁচিয়ে রাখা যেত ৪৫ ডিগ্রী কোণে, এটাকেও আবার অদল বদল করা যেত পায়াগুলির অবস্থান বদল করে। একটি নলের মত দণ্ড বন্দুকের মুখ থেকে বেরিয়ে প্রজেক্টাইলের কাজ করে। একটা রবারের কাঠামোর উপরে এক বোতল গ্যাসোলিন রাখা দণ্ডের এক প্রান্তে। এই যন্ত্রটা জ্বলন্ত বোতলগুলোকে ১০০ মিটার অথবা তার বেশি দূরত্বে ছুঁড়ে দেয় নিখুঁত লক্ষ্যে। শত্রুদের বাড়িঘরদোর যখন কাঠ বা অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়, তখন এটি একটি আদর্শ অস্ত্র। পাহাড়ি অঞ্চলে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতেও এটি উপযোগী।



রাইফেলে 'মলোটভ ককটেল' লাগাবার পদ্ধতি

যখন অবরোধের সমাপ্তি ঘটে বিজয়ে অথবা সাধিত হয় উদ্দেশ্য, সমস্ত প্লাটুনগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ফিরে আসে যেখানে তাদের পিঠের ব্যাগগুলি ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আবার সাধারণ ধরাবাঁধা কাজকর্ম শুরু হয়।

গেরিলাযোদ্ধাদের যাযাবর জীবন শুধু যে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের এক তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করে তাই নয়, কখনও কখনও তা বিভিন্ন দল বা প্লাটুনের মধ্যে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তৈরি করে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতাকে যদি ঠিকমত পরিচালনা করে তার থেকে সুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি না করা যায়, তাহলে কলামের ঐক্যের পক্ষে তা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। লড়াইয়ের প্রারম্ভ থেকেই গেরিলা যোদ্ধাদের শিক্ষিত করাটা সমস্যাসঙ্কুল। লড়াইয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে পরস্পর ব্যাখ্যা করা দরকার, তাদের উপলব্ধিটাকে গভীরতর করার জন্য তাদের নীতিকথার শিক্ষা দেওয়াও দরকার যা তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে। প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতাই হয়ে উঠবে নতুন শক্তির উৎস, কেবলমাত্র টিকে থাকার লড়াইয়ে আর একটা পরিচ্ছেদ নয়।

শিক্ষার সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে উদাহরণ। সেইজন্য নেতৃত্ব প্রতিনিয়ত উপস্থাপিত করবে এক বিশুদ্ধ এবং দায়বদ্ধ জীবনের উদাহরণ। একজন সৈন্যের পদোন্নতির ভিত্তি হবে তার সাহস, কর্মক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা, যাদের এইসব গুণাবলী নেই, দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের নিয়োগ করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে যে কোন সময় দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

একজন গেরিলা যোদ্ধার ব্যবহার বিচার করা হবে যখন সে কোন বাড়িতে কিছু চাইতে যায়। কোন পরিষেবা পাবার অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস যখন চাওয়া হয়,

তখন কিভাবে তা চাওয়া হয়েছে তার উপরে নির্ভর করে অধিবাসীরা গেরিলা দল সম্পর্কে অনুকূল অথবা প্রতিকূল মনোভাব নেবে। নেতৃত্বের উচিত বিস্তারিতভাবে এই সমস্যার সম্পর্কে আলোচনা করা, এর গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া। উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়। একটি শহরে প্রবেশ করে, সমস্ত এ্যালকোহল পান করা নিষিদ্ধ করা উচিত এবং বাহিনীকে আগেভাগে সাবধান করে দিতে হবে উচ্চমানের শৃঙ্খলা প্রদর্শন করার জন্য। শহরে ঢোকার এবং বেরোনোর পথগুলির দিকে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালানো প্রয়োজন।

সংগঠন, যুদ্ধে পারদর্শিতা, বীরত্ব এবং গেরিলাদের মানসিকতা সবকিছু কড়া পরীক্ষার মুখে পড়ে শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায়—যা যুদ্ধের সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। সাম্প্রতিক যুদ্ধে, যে কেউ ভয় পেত তাকে বর্ণনা করা হত 'অবরুদ্ধ মুখ' হিসাবে। রাজ্যচ্যুত শত্রু (বাতিস্তা) তাদের শাসনকালে প্রচার চালাত 'অবরোধ এবং ধ্বংস'। তা সত্ত্বেও, গ্রামীণ অঞ্চল ভালভাবে চিনত যে গেরিলাবাহিনী এবং যারা আদর্শগত এবং অনুভূতির দিক থেকে নেতৃত্বের কাছে অনুগত ছিল, তাদের কাছে এটা একটা সুগভীর সমস্যা নয়। প্রয়োজন হল শত্রুর অগ্রগমনকে শ্লথ করে দেওয়া, ভারী যন্ত্রের সাহায্যে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা আর রাত্রি নামার জন্য অপেক্ষা করা, কারণ রাত্রিই হল গেরিলার স্বাভাবিক বন্ধু। তারপর যথাসম্ভব চুপিসাড়ে, সবচেয়ে সুবিধাজনক পথটি বেছে নিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হবে। অন্ধকারের আড়ালে একদল গেরিলাকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে সরে পড়াকে বাধা দেওয়া খুবই কঠিন কাজ।

৪: যুদ্ধ

গেরিলা জীবনে সংগ্রাম হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাটক। যদিও তার স্থায়িত্ব স্বল্পক্ষণের, কিন্তু সেইসব উজ্জ্বল মুহূর্তগুলির এক অসাধারণ গুরুত্ব আছে, কারণ প্রত্যেক ছোট ছোট যুদ্ধ হল সংগ্রামী যোদ্ধার কাছে এক মৌলিক উপাদান।

এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে, একটা আক্রমণ এমনভাবে করতে হবে যেন জয় নিশ্চিত হয়। গেরিলা যুদ্ধের আক্রমণের কৌশল সম্পর্কে সাধারণ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রত্যেকটি আক্রমণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রথমত, আমরা বর্ণনা করব অনুকূল ভৌগলিক অবস্থানে যুদ্ধের ধরণ নিয়ে, কারণ এটাই গেরিলাযুদ্ধের আসল মডেল; এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারে কতকগুলো নীতি পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার আগে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শক্তি সঞ্চয় করে গেরিলা দল অগ্রসর হলে তার ফলশ্রুতিতে ঘটে সমতলে যুদ্ধ। এর থেকে গেরিলাদের অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয় এবং সম্ভাব্য সুবিধা গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা থেকে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

গেরিলা যুদ্ধের প্রথম ধাপে, শত্রু বাহিনীগুলি বিদ্রোহী অঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এই কলামগুলির শক্তির তারতম্য অনুযায়ী দু'ধরনের গেরিলা আক্রমণ সংঘটিত করা যায়। পরপর বলতে গেলে, প্রথমটি হল নির্দিষ্ট কয়েক মাস ধরে শত্রুদের আক্রমণ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেওয়া। এই আক্রমণটা কেন্দ্রীভূত করা যায় অগ্রগামী অংশের উপর। প্রতিকূল অঞ্চলে শত্রুবাহিনী তাদের দুটি প্রান্তই রক্ষা করতে সক্ষম হয় না, তাই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অগ্রগামী বাহিনীকে আক্রমণ করে তার সঙ্গে অন্য অংশের যোগসূত্রকে নষ্ট করতে হবে। যখন নিজেদের পর্যাপ্ত সংখ্যক যোদ্ধা নেই, রিজার্ভও নেই, আবার শত্রুরা শক্তিশালী তখন গেরিলাদের উচিত এই অগ্রগামী অংশটিকে ধ্বংস করা। কৌশলটা সহজ, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্তরের বোঝাপড়া দরকার। যতটা সম্ভব খাড়াই একটা জায়গায় যে মুহূর্তে এই অগ্রগামী বাহিনী উপস্থিত হয়, কয়েকজন সৈন্য ঐ জায়গাটিকে পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর রকমের গুলিবর্ষণ শুরু করতে হবে। একটা ছোট দল ঐ বাহিনীর অবশিষ্টাংশের সঙ্গে যখন লড়াই করবে, তখন অস্ত্র, গোলাগুলি যন্ত্রপাতি সব সংগ্রহ করে নিতে হবে। গেরিলা যোদ্ধার সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের অস্ত্রের উৎস হচ্ছে শত্রুরা এবং কিছু বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া এমন কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া উচিত নয় যেখানে অস্ত্র দখল করা সম্ভব হবে না।

যখন গেরিলাদল যথেষ্ট শক্তিশালী, তখন শত্রুদের পুরোপুরি অবরোধ করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে, গেরিলাদের অগ্রবর্তী অংশ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মজবুত হওয়া দরকার যাতে তারা শত্রুদের সামনাসামনি আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে। স্বভাবতই আক্রমণ ক্ষমতা এবং যুদ্ধনীতির জ্ঞান মাথায় রাখতে হবে। পছন্দমত কোন জায়গায় যখন শত্রুকে আটকিয়ে রাখা হয় গেরিলাদলের পশ্চাদবাহিনী শত্রুদের পিছনের অংশকে আক্রমণ করে। জায়গাটা এমনভাবে পছন্দ করতে হবে যে, পাশ থেকে আক্রমণ চালানো শত্রুদের পক্ষে কঠিন হবে। আট থেকে দশ গুণ বেশি লুকিয়ে থাকা গেরিলাযোদ্ধাদের গুলির আওতায় এসে যাবে পুরো শত্রুবাহিনী। যখন যথেষ্ট বাহিনী হাতে থাকবে, সমস্ত রাস্তাগুলো ওত পেতে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে নতুন রসদ এসে না পৌঁছোয়। অবরোধটাকে আস্তে আস্তে ছোট করে আনতে হবে, বিশেষ করে রাত্রিতে। গেরিলারা ভাল চেনে যে জায়গাটায় লড়াই করছে, আক্রমণকারীরা নয়। রাত্রিতে গেরিলারা সংখ্যায় যেন বেড়ে যায় আর শত্রুরা অন্ধকারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

এইভাবে, খুব একটা অসুবিধা ছাড়াই একটা বাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করা যায়। অন্ততঃ তাদের এমন ক্ষতি হয় যাতে আবার যুদ্ধে ফিরে আসতে এবং নিজেদের গুছিয়ে নিতে তাদের করসত করতে হয়।

যখন গেরিলাদলের শক্তি কম থাকে, তাদের উদ্দেশ্য থাকে আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদের হয় থামিয়ে দেওয়া অথবা তাদের অগ্রগতি রোখা, তখন চারটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দুই থেকে দশজনের আত্মগোপনকারী ছোট ছোট দল বাহিনীটির চারধারে ছড়িয়ে থাকবে। এইরকম পরিস্থিতিতে আক্রমণ শুরু করা যেতে পারে, ধরা যাক,

ডানপ্রান্তে। যখন শত্রুর মনোযোগ যাবে সেইদিকে এবং গুলি ছুঁড়বে। গেরিলাবাহিনীর গুলিবর্ষণ শুরু হবে বাম প্রান্তে, আবার একটু পরে পিছনের অংশে, তারপরে অগ্রবর্তী বাহিনীর উপর, এইভাবে চলতেই থাকবে।

খুব কম গোলাগুলি খরচ করে শত্রুকে অনির্দিষ্টকাল এইভাবে আটকিয়ে রাখা যেতে পারে।

শত্রুদের বাহিনীকে আক্রমণের কলাকৌশল যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত এলাকার উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে একটা অবরুদ্ধ জায়গায় প্রথম আক্রমণটা হানা উচিত রাত্রিতে অগ্রগামী রক্ষীবাহিনীর উপর, অবশ্যই অতর্কিতে। অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ নিয়ে কুশলী যোদ্ধারা অবস্থাটা আয়ত্বে আনতে পারবে। নিয়মিত অবরোধের ক্ষেত্রে পালাবার পথগুলি কয়েকজন গেরিলাকে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যাতায়াতের পথগুলিতে গুপ্ত ঘাঁটি করতে হবে ; সেগুলিকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে একজন যদি অসফল হয়, পড়ে যায় অথবা পিছিয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয়জন, তারপরের জন এইভাবে তৈরি থাকবে। যেখানে আতর্কিত আক্রমণ সম্ভব না হয়, একটা শিবির গুড়িয়ে দেবার সাফল্য নির্ভর করে অবরোধকারী শক্তির শত্রুর উদ্ধারকারী বাহিনীকে বাধা দেবার ক্ষমতার উপর। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কামান, মর্টার, যুদ্ধবিমান এবং ট্যাঙ্ক স্বভাবতই শত্রুদের সাহায্য করে। অনুকূল জমিতে ট্যাঙ্ক তত মারাত্মক অস্ত্র নয়। একে সরু রাস্তায় চলতে হবে, যখন তখন মাইনের শিকার হতে পারে। এইসব যানগুলির আক্রমণ ক্ষমতা খুব সীমিত, কেননা তাদের সারি বেঁধে চলতে হয়, বড়জোর দুটো পাশাপাশি চলতে পারে। ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং নিশ্চিত অস্ত্র হল মাইন, কিছু মুখোমুখি যুদ্ধে, বিশেষ করে খাড়াই জায়গায় 'মলোটভ ককটেল'-এর ব্যবহারের জুড়ি নেই। এখনও আমরা বাজুকার কথা বলি নি, যা গেরিলাদের হাতে একটা ফলপ্রসূ অস্ত্র, কিন্তু প্রাথমিক ধাপে যা যোগাড় করা দুরূহ। পরিখা খুলে তার উপর চালা বানিয়ে মর্টারের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা সম্ভব। অবরোধের সময় মর্টার একটি কার্যকরী অস্ত্র, কিন্তু আক্রমণকারীরা যদি সচল থাকে তাহলে এর কার্যক্ষমতা কমে যায়, যদি না বড় ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয়। সাঁজোয়া কামান এই ধরনের যুদ্ধে খুব বড় ভূমিকা পালন করে না, কারণ যেখানে যথেষ্ট জায়গা আছে সেখানেই এগুলি স্থাপন করা যেতে পারে, আর প্রতিনিয়ত চলমান লক্ষ্যবস্তু তা দেখতেও পায় না। বিমান আক্রমণ আক্রমণকারীর হাতে এক বড় অস্ত্র, কিন্তু এর আক্রমণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ এর লক্ষ্যবস্তু হল ছোট ছোট পরিখাগুলি যেগুলি থাকে লুকানো


মর্টার থেকে রক্ষার উপায়

অবস্থায়। যুদ্ধ বিমান থেকে উচ্চ বিস্ফোরক বা নাপাম বোমা ফেলা যায়। দুটোই প্রকৃত বিপদের চাইতে কেবল অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তার ওপরে, গেরিলা বাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের খুব কাছাকাছি চলে গেলে বিমান থেকে আক্রমণ শানানো মুস্কিল হয়ে পড়ে, কেননা তাতে তাদের নিজেদের অগ্রগামী বাহিনীরও ক্ষতি হতে পারে।

কাঠ এবং দাহ্য পদার্থে তৈরি শিবিরগুলি নিকট দূরত্ব থেকে আক্রমণে 'মলোটভ ককটেল' খুব কার্যকরী অস্ত্র। বেশি দূরত্বে ১৬ ক্যালিবার শটগান থেকে বোতলে দাহ্য পদার্থের সঙ্গে ফিউজ লাগিয়ে ছোঁড়া যায়, একথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের মাইনের মধ্যে, সবচেয়ে কার্যকরী হল দূর নিয়ন্ত্রণে বিস্ফোরণ করা, যদিও এর জন্য দরকার বিশেষ কারিগরী দক্ষতা। কনট্যাক্ট, ফিউজ এবং সবার উপরে ইলেকট্রিক মাইনও খুব কার্যকরী অস্ত্র এবং পার্বত্য রাস্তায় জনগণের বাহিনীর জন্য যে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে তা এক কথায় দুর্ভেদ্য।

অস্ত্রবাহী সাঁজোয়া গাড়ির বিরুদ্ধে ভাল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে রাস্তায় এমনভাবে ঢালু গর্ত খুড়ে রাখা যাতে ট্যাঙ্কগুলি সহজেই গর্তে পড়ে যায়, কিন্তু পরে আর সেখান থেকে বেরুতে পারে না। গর্তগুলোকে শত্রুদের চোখ থেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হবে, বিশেষ করে রাত্রিতে অথবা যখন গেরিলা বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে শত্রুবাহিনী ট্যাঙ্কের সামনে এগিয়ে আসতে পারে না।

খুব খাড়াই নয় এমন অঞ্চলে শত্রুদের বাহনের সাধারণ মাধ্যম হল ট্রাক, যেগুলো প্রায় খোলাই থাকে। অস্ত্রবাহী গাড়িগুলো আগে যায়। পিছনে থাকে ট্রাকে সৈন্যবাহিনী। গেরিলা বাহিনীর শক্তির নিরিখে পুরো বাহিনীটাকেই ঘিরে ফেলা সম্ভব অথবা কয়েকটি ট্রাককে আক্রমণ করে, পাশাপাশি মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে খুব দ্রুততার সঙ্গে নিহত ও আহত সৈন্যদের অস্ত্র হাতিয়ে ঐ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।


ট্যাঙ্কের ফাঁদ

খোলা ট্রাকগুলিতে আক্রমণের সময়, অস্ত্রের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে উপযোগী হল শটগান। একটা ১৬ ক্যালিবার শটগান ১০ মিটার পর্যন্ত দূরত্বে আঘাত হেনে কয়েকজন ট্রাকযাত্রীকে নিহত করতে পারে। অন্যরাও আহত হবে, যাতে ওরা এক বিরাট ধন্দে পড়ে যাবে। যদি পাওয়া যায় তবে গ্রেনেড হচ্ছে আর এক দারুণ অস্ত্র।

এই সমস্ত আক্রমণের ক্ষেত্রেই চকিত আক্রমণ হচ্ছে মূল কথা, অন্তত প্রথম শটটি হওয়ার মুহূর্তে এটাই গেরিলা যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য। চকিত আক্রমণ সম্ভব হয় না যদি ঐ অঞ্চলের কৃষকেরা জেনে যায় যে বিদ্রোহী বাহিনী ওখানে উপস্থিত আছে। এই কারণে, সমস্ত আক্রমণই করা উচিত

রাত্রিতে। একমাত্র সেই সমস্ত গেরিলা যাদের আনুগত্য ইতিমধ্যেই প্রমাণিত তারাই এই সমস্ত আক্রমণের কথা আগাম জানবে এবং সেইমত যোগাযোগ স্থাপন করবে। পিঠের ব্যাগে খাবার ভর্তি করে নিয়ে মার্চ শুরু হবে, কারণ লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকার জায়গায় এক, দুই, তিন অথবা চারদিনও থাকতে হতে পারে।

কৃষকদের বিচক্ষণতার উপর কখনই সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, কারণ নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে এবং আরও একটা কারণ, একটা পরাজয়ের পরে তাদের উপরে শত্রুসৈন্যদের অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠুর ব্যবহার। সন্ত্রাসের বীজ পুঁতে তার সাহায্যে কাউকে দিয়ে কথা বলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করিয়ে নেওয়া যায় ; নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই তারা এসব করে।

সাধারণভাবে গোপন স্থানে লুকিয়ে বা ওৎ পেতে থাকার জন্য স্থানটি নির্বাচন করা উচিত গেরিলা দলের নিয়মিত শিবির থেকে কমপক্ষে এক দিনের পথের দূরত্বে, কারণ শত্রুরা প্রায় নিখুঁতভাবে জানে তাদের শিবিরের অবস্থান সম্পর্কে।

আগেই বলেছি আমরা যে, কোন যুদ্ধে গুলি চালানোর প্রকৃতি নির্ভর করে বিরুদ্ধ পক্ষের অবস্থানের উপরে। একদিকে, যাদের যথেষ্ট পরিমাণে গোলাবারুদ আছে তাদের হিংস্র এবং দ্রুত গুলি চালনা, অন্যদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ গেরিলাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গুলিচালনা, যারা প্রত্যেকটি বুলেটের মূল্য জানে, এবং খরচের দিকে কৃপণ থেকে যারা লড়াইটাকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চালায়, প্রয়োজনের তুলনায় একটাও গুলি বেশি খরচ না করে। কোন শত্রুকে পালিয়ে যেতে দেওয়া বা গুপ্ত স্থানটির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার না করা মোটেই কাম্য নয় কেবলমাত্র গুলি সঞ্চয় করার তাগিদে, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে কতটা খরচ করা যেতে পারে তা আগাম নির্ণয় করে নিতে হবে এবং লড়াইটা চালাতে হবে এই নিয়ম মেনে।

গেরিলাযোদ্ধার কাছে গুলিবারুদ এক চিরন্তন সমস্যা। অস্ত্র সবসময়ই পাওয়া যায়। যা পাওয়া যায় তা সবসময়ে ব্যবহার হয় না। অস্ত্র পাওয়া যায় গুলি সমেত, কিন্তু শুধু গুলিবারুদ খুব কম ক্ষেত্রেই মেলে। প্রত্যেকটা দখল করা অস্ত্রে তার প্রয়োজনীয় গুলিটুকুই ভরা থাকে, কোন অতিরিক্ত থাকে না, যা অন্যকে দেওয়া যায়। তাই এই ধরনের যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় গুলিবারুদ বাঁচানোর নীতিই হচ্ছে মৌলিক কৌশল। একজন দক্ষ গেরিলা নেতা পিছিয়ে আসার ক্ষেত্রে পরম যত্ন নেন। এটা হতে হবে সময়মত, দ্রুত এবং সমস্ত আহত কমরেডকে এবং জিনিসপত্র যেমন, পিঠের ব্যাগ এবং অস্ত্রশস্ত্র, যাতে ঠিকমত নিরাপদে সরানো যায় তার ব্যবস্থাও করতে হবে। পিছিয়ে আসার সময় যেন বিদ্রোহীরা কোন চকিত আক্রমণের মুখে না পড়ে বা ঘেরাও হয়ে যায়। তাই, নির্বাচিত পথের মাঝে এমন জায়গায় প্রহরী রাখতে হবে যেখানে তাদের বাহিনীকে এগিয়ে এনে ঘেরাও করার কোন সম্ভাবনা আছে শত্রুদের পক্ষে, এবং যখন শত্রুবাহিনী ঘিরে ফেলতে পারে বিদ্রোহীদের, তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই নিপুণভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে দ্রুত খবর আদানপ্রদান করা যায়।

যুদ্ধের সময় কিছু নিরস্ত্র গেরিলা থাকা দরকার। এই সমস্ত লোকেরা নিহত অথবা আহত সহযোদ্ধাদের বন্দুক, এবং যুদ্ধে দখল করা বা বন্দীদের বন্দুকগুলি উদ্ধার করবে, তারা বন্দীদের দায়িত্ব নেবে, আহতদের সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে এবং খবর আদানপ্রদানের কাজ করবে। তাছাড়া বার্তাবাহকদের একটা ভাল বাহিনী থাকা দরকার, যারা পূর্ব অভিজ্ঞতা সহকারে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সতর্কতাগুলি রিলে প্রথায় পৌঁছে দেবে।

সশস্ত্র যোদ্ধা ছাড়াও এই ধরনের নিরস্ত্র লোকের সংখ্যার তারতম্য ঘটে। তবে সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক দশজনের জন্য দু'জন বা তিনজন। এর মধ্যে তাদেরও ধরা হয় যারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে বা যারা যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে পশ্চাদপসরনের পথে প্রহরা দেয় এবং উপরে বর্ণিত বার্তাবাহকের কাজ করে।

যখন একটা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ লড়া হয়, অর্থাৎ যখন একটা বিশেষ সীমার ওপারে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর অগ্রগমনকে গেরিলা বাহিনী প্রতিহত করার চেষ্টা করে, তখন যুদ্ধটা দাঁড়ায় জায়গা দখলের লড়াই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে চকিত আক্রমণই নির্ণায়ক শক্তি হয়ে পড়ে। এইসব ক্ষেত্রে যেহেতু পরিখা এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কৃষকদের দৃষ্টিগোচরে থাকে, তাই বন্ধুভাবাপন্ন অঞ্চলই এই ধরনের লড়াইয়ের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। এই ধরনের যুদ্ধের সময়ে সরকার সাধারণত ঐ অঞ্চলে একটি অবরোধ সৃষ্টি করে এবং যে সমস্ত কৃষকরা তখনও পালিয়ে যায় নি, তারা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে গেরিলাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের বাইরে পা রাখে। যদি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এইসব লোকেরা এলাকা ত্যাগ করে বাইরে যায়, তাহলে তা সমূহ বিপদ ডেকে আনে। কারণ শত্রুসৈন্যের কাছে তথ্য পাচার হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় গেরিলাবাহিনীর কৌশলগত নীতি হচ্ছে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা।

প্রতিরক্ষা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শত্রুদের অগ্রবর্তী বাহিনী সবসময়েই একটা লুকানো ফাঁদে পড়ে যায়। এটা খুব দরকারী একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপের বিষয় যে প্রত্যেক যুদ্ধে অগ্রগামী বাহিনীর লোকজন পালাবার কোন সুযোগ না পেয়ে নিহত হয় ; এই ব্যাপারটা শত্রুবাহিনীর ভিতরে একটা ঝুঁকির চেতনা নিয়ে আসে যার জন্য বাস্তবে কেউই অগ্রবর্তী বাহিনীতে থাকতে চায় না। আবার এটাও অবশ্যম্ভাবী যে, একটা বাহিনীর সামনে যদি অগ্রনী দল না থাকে, তাহলে তাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কাউকে না কাউকে দায়িত্বটা নিতেই হবে। এ ছাড়াও যদি তারা উপযোগী অবস্থা পায় তাহলে বিদ্রোহী বাহিনী শত্রুকে অবরোধ করবে, অথবা ব্যতিব্যস্ত করার কৌশল যেমন পার্শ্ব আক্রমণ বা শুধুমাত্র শত্রুকে সামনে এগোতে বাধা দেওয়ার কাজ করবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শত্রু যেসব অঞ্চলে পার্শ্ব আক্রমণ চালাতে পারে সেইসব জায়গাগুলি শক্তিশালী করতে হবে।

ধরে নিই, উপরে যেরকম যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি গেরিলা এবং অস্ত্র পাওয়া যাবে। বোঝাই যায়, কোন একটি অঞ্চলের দিকে আসার সমস্ত সম্ভাব্য পথ অবরোধ করতে গেলে অনেক লোক দরকার, কারণ অনেক রাস্তা থাকতেই পারে।

সাঁজোয়া গাড়িগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ এবং আক্রমণের পন্থা বাড়ানো যেতে পারে, যে সমস্ত স্থায়ী পরিখা রয়েছে তার অস্তিত্ব যাতে শত্রুরা জানতে না পারে তার জন্য। সাধারণত এই ধরনের যুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্যে এমনকি যদি প্রয়োজন হয় মৃত্যুবরণ করারও আদেশ দেওয়া হয় এবং এটাও প্রয়োজনীয় যে, প্রত্যেক যোদ্ধা বেঁচে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে।

দূর থেকে পরিখাগুলি যত লুকানো থাকবে, ততই মঙ্গল। ওপরটায় ছাউনি দেওয়া দরকার যাতে মর্টার হামলা আটকানো যায়। ৬০.১ বা ৮৫ মিমি. মর্টারগুলো, যেগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয়, সাধারণ স্থানীয় জিনিসপত্র যেমন কাঠ, মাটি বা পাথর দিয়ে তৈরি ছাদ ভেদ করতে পারে না। ছাদের ওপরে ছদ্ম আবরণের (ক্যামুফ্লেজ) ব্যবস্থা রাখতে হবে। পালিয়ে যাবার একটা রাস্তা জরুরী অবস্থা হিসাবে তৈরি করতে হবে, যাতে অল্প ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

গুলি চালনার কোন নির্দিষ্ট লাইন থাকে না। এ ধরনের কোন লাইন টানা কেবলমাত্র তত্ত্বগত, কোন সংকটজনক মুহূর্তে হয়তো তা করা হয়, কিন্তু তা চূড়ান্ত পরিবর্তনশীল, দুপক্ষের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। যেটার অস্তিত্ব আছে সেটা একটা বিস্তৃত 'নো ম্যানস ল্যান্ড'। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের সময় এই 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' থাকে স্থানীয় লোকজন, যারা কিছু ক্ষেত্রে দুপাশের সঙ্গেই সহযোগিতা করে, যদিও বেশিরভাগ লোকই বিদ্রোহী বাহিনীকে সমর্থন করে। এই জনগোষ্ঠীর সবাইকে এলাকা থেকে সরানো সম্ভব হয় না তাদের বিপুল সংখ্যার জন্য। দু'পক্ষের পক্ষেই এটা অসুবিধাজনক কারণ খাদ্য সরবরাহের জন্য তারা এই জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। এই 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' চলে পর্যায়ক্রমিক অনুপ্রবেশ, দিনে অত্যাচারী শত্রসৈন্য, রাতে গেরিলারা। গেরিলাদের পক্ষে এই অঞ্চলটি তাদের জীবনধারনের প্রয়োজনের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ওখানকার শ্রমিক কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করা এবং তাদের সঙ্গে সম্ভাব্য সব রকমের ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা গেরিলাদের অবশ্যকর্তব্য।

এই ধরনের যুদ্ধকৌশলে পরোক্ষ যোদ্ধা অর্থাৎ যারা নিরস্ত্র তাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই আমরা সংযোগ রক্ষার কিছু রূপরেখা নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু গেরিলা সংগঠনের ভিতরে এটা একটা প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে দূরের নেতৃত্বের ঘাঁটি অথবা দূরতম গেরিলা দল—এই দুইয়ের ভিতর এমনভাবে সংযোগ রক্ষা করতে হবে যাতে সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে সংবাদ পৌঁছে যায়—যেমন অঞ্চলই হোক, অনুকূল অথবা প্রতিকূল। প্রতিকূল অঞ্চলে লড়াইরত গেরিলা দল আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যেমন টেলিগ্রাফ, রাস্তা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে না, কেবলমাত্র রেডিও ছাড়া। যদি আবার সেগুলি শত্রুদের হাতে পড়ে, তবে একটা ঝামেলার কাজ করতে হয়—কোড, ফ্রিকোয়েন্সি বদলানো।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে আমরা এসব বলছি। শত্রুদের সমস্ত কার্যাবলীর দৈনিক সঠিক সংবাদ সংগ্রহ আমাদের লোকেরাই করে থাকে। গুপ্তচরবৃত্তির পদ্ধতিগুলি যত্নসহকারে শিখতে হবে, ভালভাবে ছক কষতে হবে এবং খুব সাবধানতার

সঙ্গে তার জন্য লোক নিয়োগ করতে হবে। প্রতিপক্ষীয় গুপ্তচর বিরাট ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু অতিরঞ্জিত সংবাদ অনেক সময় আরও ক্ষতি করে, বিপদকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোতেই বিপদ। এটাও উচিত নয় যে বিপদকে ছোট করে দেখা, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের লোকেদের প্রবণতাই হল বাড়িয়ে বলা বা অতিরঞ্জিত করা। যে রহস্যময় মানসিকতা থেকে ভূত এবং সমস্তরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপার সম্পর্কে প্রচার করা হয়, তেমনি করে এক প্লাটুন বা অল্প কিছু সৈন্য দেখা দিলেই এক অতিকায় সৈন্যবাহিনীর গল্প ফাঁদা হয়। বাইরে থেকে দেখলে একজন গুপ্তচরকে নিরপেক্ষ বলেই মনে হবে। শত্রু যেন না জানে তার সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যোগাযোগ আছে। যতটা শক্ত মনে হয় কাজটা অতটা কঠিন নয়। যুদ্ধ চলাকালীন এমন অনেক লোকের দেখা পাওয়া যায় : ব্যবসায়ী, পেশাদার লোকেরা, এমনকি ধর্মযাজকরা এ ব্যাপারে সাহায্য করেন এবং সময়মত তথ্য যুগিয়ে যান।

গেরিলাযুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে যে সংবাদটা পৌঁছয় আর শত্রুর কাছে থাকা সংবাদের মধ্যে তাৎপর্যময় পার্থক্য। যখন শত্রুদের কাজ করতে হয় পুরোপুরি বৈরিভাবাপন্ন অঞ্চলে, কৃষকরা থাকে গোমড়া মুখে নীরব, প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই বিদ্রোহীদের কোন বন্ধু বা আত্মীয় পরিজন বাস করে এবং বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের সব সংবাদ পৌঁছে যায় গেরিলা বাহিনীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা এলাকার গেরিলা দলটির কাছে।

গভীর সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন, যখন শত্রুবাহিনী এমন জায়গায় প্রবেশ করে সবাই প্রায় গেরিলাদের পক্ষে খোলাখুলি, কৃষকেরা সবাই জনসাধারণের দাবীর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। কৃষকদের অধিকাংশই জনগণের বাহিনীর সঙ্গে চলে যেতে চায় তাদের বাচ্চাকাচ্চা আর কাজ ফেলে রেখে, অন্যেরা এমনকি পুরো সংসার নিয়েই পালাতে ইচ্ছুক, কেউ কেউ অপেক্ষা করে দেখতে চায়। যখন কোন গেরিলা অঞ্চলে শত্রুসৈন্যরা প্রবেশ করে তখন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয় ওখানকার পরিবারগুলির জীবনে, কারণ তারা থাকে খুব কোণঠাসা এবং অসহায় অবস্থায়। তাদের সবরকম সাহায্য করা উচিত, কিন্তু তাদের নিয়মিত কাজের জায়গা ছেড়ে অন্য এক অচেনা, আজানা জায়গায় চলে যেতেও তাদের মন চায় না, এ ধরনের জায়গা পরিবর্তনে কি কষ্ট তাদের কপালে আছে সেই ভেবে তারা শঙ্কিত হয়।

জনগণের শত্রুরা ঠিক কি ধরনের অত্যাচার চালাবে তার রূপরেখা নিয়ে কিছু আগাম বলা সম্ভব নয়। যদিও সাধারণ অত্যাচারের ধরণটা প্রায় একইরকম ; জায়গাটার বিশেষ সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে তারা বড় অথবা ছোট ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কোন লোক যদি তার সমাজ সংসার ত্যাগ করে গেরিলা অঞ্চলে চলে যায়, তাহলে বড় কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই এই অপরাধে তার বাড়িঘর, সম্পত্তি সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এমনকি তার পরিবারের সব সদস্যকে হত্যাও করা হয়। তাই যুদ্ধে স্থানীয় রীতিনীতি মেনে অথবা দেশকাল পাত্র বিচার করে শত্রু আক্রমণে যে

সমস্ত কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের স্থানান্তরে ঠিকমত সাহায্য করা, ও সাংগাঠনিক কাজকর্ম করা দরকার।

স্বভাবতই তাদের সরবরাহের রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়ে শত্রুসৈন্যের বাহিনীকে এলাকা থেকে উৎখাত করার প্রস্তুতি চালাতে হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কেটে দিতে হবে, ছোট ছোট গেরিলাদল দিয়ে তাদের সরবরাহ বজায় রাখার প্রচেষ্টা ধ্বংস করে তাদের বেশি সংখ্যক সৈন্যকে কেবল সরবরাহ ঠিক রাখার কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে।

যেখানেই যুদ্ধ শুরু হয়, সমস্ত লড়াইয়ের ময়দানেই অতিরিক্ত বাহিনীকে (reserve) ঠিকমত ব্যবহার করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে গেরিলা বাহিনী কিন্তু কদাচিৎ এই ধরনের অতিরিক্ত লোকজনের ব্যবস্থা রাখতে পারে কারণ সেখানে তারা যখন আঘাত হানে তখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সত্ত্বেও কিছু গেরিলাকে এমন অবস্থানে রাখা উচিত যাতে তারা যেন অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে, যে কোন প্রতিআক্রমণ রুখে দিতে পারে অথবা যে কোন মুহূর্তে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। গেরিলা বাহিনীর সংগঠনের অভ্যন্তরে, যদি সেরকম কোন পরিস্থিতি অথবা সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে একটা উপযোগী প্লাটুন তৈরি রাখা উচিত যাদের গুরুতর বিপদের জায়গায় পাঠানো যায়। এদের নাম দেওয়া যেতে পারে 'সুইসাইড প্লাটুন' বা ঐরকম কিছু যাতে তাদের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়। এই 'সুইসাইড প্লাটুন, যে কোন যুদ্ধে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠবে : শত্রুর অগ্রগামী অংশকে চকিত আক্রমণ, সবচেয়ে অরক্ষিত এবং বিপজ্জনক অবস্থানে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে, অন্যকথায় বলতে গেলে যেখানে শত্রুরা গেরিলাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে সেখানেই এগিয়ে যাবে এ প্লাটুন। কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়েই গঠিত হবে এই বাহিনী। এই বাহিনীতে জায়গা পাওয়া এক বিশেষ সম্মান হিসাবে পরিগণিত হবে। কালক্রমে এই বাহিনীই গেরিলা যোদ্ধাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় এবং যে গেরিলা যোদ্ধার গায়ে এই দলের তকমা থাকে, সে সমস্ত সহযোগীদের চোখে শ্রদ্ধা আর সম্মানের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

৫. গেরিলা যুদ্ধের প্রারম্ভ, বিকাশ এবং সমাপ্তি

ইতিমধ্যেই আমরা গেরিলা যুদ্ধের প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এরপরে আমরা আলোচনা করব এই যুদ্ধের আদর্শ বিকাশ নিয়ে, অনুকূল অঞ্চলে এবং তার বাইরে কিভাবে একটিমাত্র কেন্দ্রবিন্দুর উত্থান হয় সে বিষয়ে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, কিউবার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা তত্ত্বগত রূপ দেবার চেষ্টা করব। একদম সূচনারম্ভে, মোটামুটি সশস্ত্র এবং সুসংবদ্ধ দল দুর্গম এবং গভীর দুর্ভেদ্য অঞ্চলে লুকিয়ে থাকে, কৃষকদের সঙ্গে খুব কমই যোগাযোগ থাকে তাদের। শত্রুসৈন্যকে একটা সফল আক্রমণের পরেই তাদের খ্যাতি বেড়ে যায়। জমি থেকে

উৎখাত হওয়া এবং তা রক্ষা করায় সংগ্রামরত কিছু কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণীর কিছু আদর্শবান মানুষজন যোগ দেয় এই কেন্দ্রীয় দলে। নতুন শক্তি সঞ্চয় করে জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে কাজকর্ম শুরু করে দলটি ; স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আরও সংযোগ স্থাপন করে বারবার আক্রমণ করে, পরে লুকিয়ে পড়ে হঠাৎ করে কোন শত্রুবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তাদের অগ্রগামী অংশকে ধ্বংস করে। আরও লোক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে তাদের, কিন্তু তাদের সংগঠন একইরকম থেকে যায়। একটু কম সাবধানী হয়ে, আরও ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে তারা অভিযান চালায়।

পরে তারা বেশ কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী শিবির করে, শত্রুসৈন্যবাহিনীর এগিয়ে আসার খবর পেলে তারা ঐ স্থান ত্যাগ করে। বোমাবর্ষণ হলে বা কোন বিপদের আঁচ পেলেও জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হয়। গেরিলাদলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কারণ জনগণের মধ্যে কাজ করার ফলে প্রত্যেক কৃষকই মুক্তিসংগ্রামে কাজে লাগার জন্যে উৎসাহী হয়। অবশেষে, একটা দুর্ভেদ্য জায়গা পছন্দ করা হয়, একটা স্থায়ী জীবনযাপন শুরু হয়, প্রথম ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় : একটা জুতোর ফ্যাক্টরী, একটা সিগার এবং সিগারেটের, একটা জামাকাপড়, একটা অস্ত্র, বেকারি, হাসপাতাল, সম্ভব হলে একটা রেডিও ট্রান্সমিটার এবং একটা ছাপাখানা।

এখন গেরিলাদলের একটা সংগঠন তৈরি হয়েছে, একটা নতুন কাঠামোয়। একটা বৃহৎ আন্দোলনকে তারা নেতৃত্ব দেয়, একটা ছোটখাট সরকারের বৈশিষ্ট্য আছে তাদের। ন্যায় বিচারের জন্য একটা আদালত প্রতিষ্ঠা হয়। আইন প্রণয়ন করা হয়। কৃষকদের আদর্শে দীক্ষিত করার কাজটা চালিয়ে যাওয়া হয়, স্থানীয় শ্রমিকদেরও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। শত্রু আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয় ; রাইফেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একটা সময় আসে যখন গেরিলা যোদ্ধার সংখ্যার তুলনায় তাদের কার্যক্ষেত্রের এলাকা সমানুপাতে বাড়ে না ; সেই সময়ে একটা যথাযথ আকারের সৈন্যবাহিনীকে আলাদা করে একটা কলাম বা প্লাটুন গঠন করা হয়, তারপর তারা যাত্রা করে নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে।

এই দ্বিতীয় দলের কাজকর্ম শুরু হয় একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে, কারণ তার সঙ্গে রয়েছে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের বাহিনীর প্রভাব রয়েছে। আসল কেন্দ্রটিও ক্রমাগত বেড়ে চলে ; তখন সে বিভিন্ন জায়গা থেকে যথেষ্ট খাদ্য সাহায্য পাচ্ছে। কোন কোন সময় বন্দুকও; নতুন নতুন লোক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। নতুন আইন তৈরি চলছে, স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেখানে গেরিলাদের আদর্শ বোঝানো হচ্ছে, নতুনদের প্রশিক্ষণও চলছে ; যুদ্ধ যত ছড়িয়ে পড়ছে নেতারা শিক্ষালাভ করছেন এবং তাঁদের বাহিনীর সংখ্যাগত ও গুণগত মান বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তাঁদের বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ছে, যার মাধ্যমে তাঁদের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতারও বিকাশ ঘটছে।

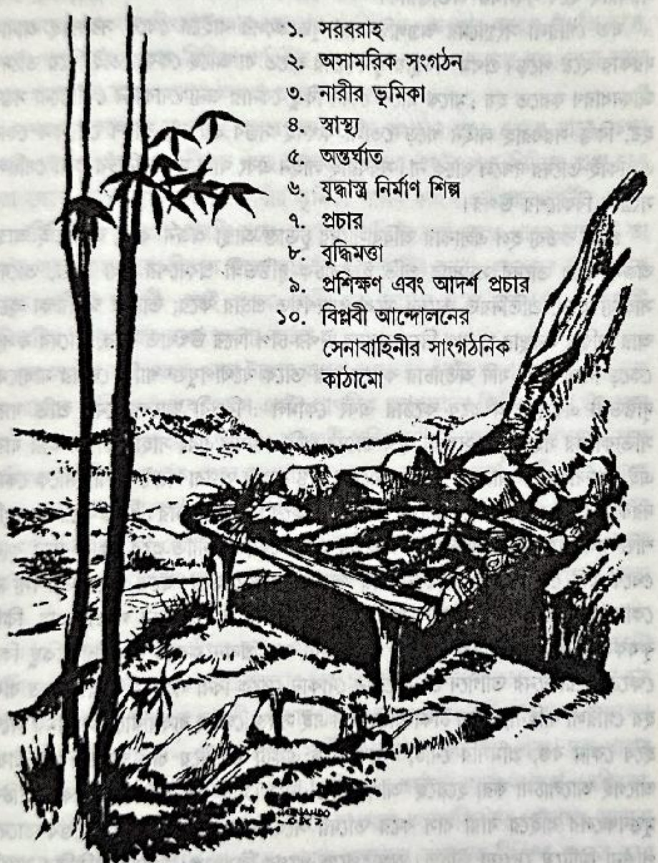
যদি কোন দূরবর্তী অঞ্চল থাকে, তাহলে এক বিশেষ মুহূর্তে একটি দল সেইদিকে রওনা হয়। যাতে অগ্রগমনের ধারা বজায় থাকে এবং ক্রমাগত এই আবর্তনচক্র চলতে থাকে।

কিন্তু গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে প্রতিকূল এক শত্রু অঞ্চলও আছে। সেখানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেরিলাদল অনুপ্রবেশ করবে, রাস্তাঘাটের ক্ষতি করে, সেতু উড়িয়ে দেয়, মাইন পোঁতে, বিপদ সঙ্কেত সৃষ্টি করে। যুদ্ধের উত্থান-পতনের সঙ্গে আন্দোলন বেড়ে চলে; একই সময়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিকূল অঞ্চলে গেরিলা শক্তির প্রবেশ সহজতর হয় এবং শুরু হয় সর্বশেষ স্তর, অর্থাৎ শহরে গেরিলা যুদ্ধ।

সমগ্র অঞ্চলে লক্ষ্যণীয়ভাবে অন্তর্ঘাত বেড়ে চলে। জনজীবন পঙ্গু হয়ে যায়; অঞ্চলটি জয় করা সম্ভব হয়। তখন অন্য অঞ্চলে যায় গেরিলারা, সেখানে বিভিন্ন ফ্রন্টে শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করে। ইতিমধ্যেই ভারী অস্ত্রশস্ত্র এমনকি কিছু ট্যাঙ্কও হস্তগত হয়েছে, লড়াইটা দাঁড়িয়েছে সমানে সমানে, শত্রুরা পরাজিত হয় যখন ক্রমান্বয়ে আংশিক বিজয়গুলির পরিণতিতে আসে সুনির্দিষ্ট জয়লাভ। অন্য কথায় বলতে গেলে, গেরিলা দলের আরোপিত শর্তে শত্রুদের যুদ্ধ করতে বাধ্য হতে হয়। সেখানেই তাদের ধ্বংস, আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় তারা। এটি কিউবার মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্তরের এক রূপরেখা, কিন্তু এর একটা বিশ্বজনীন তাৎপর্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও সবসময় হয়তো জনগণের সঙ্গে একই রকম অন্তরঙ্গতা, পরিস্থিতির সাযুজ্য এবং আমাদের যুদ্ধের মত নেতৃত্ব না-ও থাকতে পারে। এটা বলাই বাহুল্য যে যোদ্ধা এবং রাজনীতিকের চূড়ান্ত গুণাবলী মূর্ত হয়েছিল ফিদেল কাস্ত্রোর মধ্যে ; আমাদের যাত্রাপথ সংগ্রামে এবং আমাদের বিজয়ের জন্য আমরা ঋণী তার কাছে। এটা আমরা বলতে পারি না যে তাকে ছাড়া আমাদের বিজয়লাভ করা সম্ভব হত না, কিন্তু সেই বিজয়ের জন্য আরও অনেক মূল্য দিতে হত এবং হয়তো তা এত সম্পূর্ণ হত না।

তৃতীয় অধ্যায়

গেরিলা ফ্রন্টের সংগঠন



১. সরবরাহ
২. অসামরিক সংগঠন
৩. নারীর ভূমিকা
৪. স্বাস্থ্য
৫. অন্তর্ঘাত
৬. যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্প
৭. প্রচার
৮. বুদ্ধিমত্তা
৯. প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ প্রচার
১০. বিপ্লবী আন্দোলনের সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো

১. সরবরাহ

গেরিলাদের কাছে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় জিনিস হল সরবরাহ ব্যবস্থা। মাটির সঙ্গে সংস্পর্শে থাকা গেরিলারা জীবনধারণ করে এই মাটি থেকে উৎপন্ন পণ্যের সাহায্যে, সাথে সাথে যারা তাদের জিনিস সরবরাহ করে সেই কৃষকদের জীবিকানির্বাহের ব্যাপারটাও তাদের মাথায় রাখতে হয়। বিশেষ করে কঠিন গেরিলা লড়াইয়ের শুরুর দিকে দলটির পক্ষে নিজেদের খাবার নিজেরা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না, এ ছাড়াও

আছে তাদের সরবরাহগুলি সহজেই শত্রুসৈন্যের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া এবং ধ্বংস করার বিপদ যখন অঞ্চলটিতে অত্যাচারী শক্তি জেঁকে বসে রয়েছে। তাই প্রথম দিকে সরবরাহ হবে সবসময় অভ্যন্তরীণ।

যত গেরিলা সংগ্রামের অগ্রগতি হয়, যুদ্ধাঞ্চলের বাইরে থেকে সরবরাহ আনার দরকার হয়ে পড়ে। প্রথম অবস্থায় কৃষকদের হাতে যা আছে কেবল তাই দিয়ে তাদের জীবনধারণ করতে হয় ; মাঝে মাঝে কোন কিছু কেনার জন্য দোকানে পৌঁছানো সম্ভব হয়, কিন্তু সরবরাহ লাইন গড়ে তোলা কখনই সম্ভব হয় না, কারণ সেরকম কোন এলাকাই তাদের দখলে থাকে না। সরবরাহ লাইন এবং খাদ্য মজুত নির্ভর করে গেরিলা সংগ্রাম বিকাশের উপর।

প্রথম কর্তব্য হল এলাকার অধিবাসীদের চূড়ান্ত আস্থা অর্জন করা, আর এই আস্থা অর্জন সম্ভব তাদের সমস্যার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তাদের সাহায্য করে, প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে আদর্শগত প্রচার করে, তাদের স্বার্থরক্ষা করে আর অস্থির অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর চাপ দিয়ে উৎখাত করে, তাদের ফসল কেড়ে নিয়ে কেউ যদি অত্যাচার করতে চায় তাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে। দৃষ্টিভঙ্গী একই সঙ্গে হবে কঠোর এবং কোমল : বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি যারা সত্যিকারের সহানুভূতি সম্পন্ন হবে তাদের প্রতি কোমল এবং সাহায্যকারী। আর যারা এই আন্দোলনকে আক্রমণ করবে, বিভেদ সৃষ্টি করবে অথবা শত্রুসৈন্যবাহিনীকে কোন দরকারী তথ্য পৌঁছে দেবে তাদের প্রতি হতে হবে চূড়ান্ত কঠোর। ধীরে ধীরে অঞ্চলটি শক্তিশালী হবে, তখন লড়াইটা সহজতর হবে। মৌলিক নীতি হবে কোন বন্ধুর কাজ থেকে যাই কেনা হোক না কেন তার জন্য দাম দিতে হবে। হতে পারে তা শস্য বা কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। প্রায়ই এইসব জিনিস দান হিসাবে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষকসমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এ ধরনের দান প্রদান করতে অপরাগ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে কোন কোন দোকান থেকে বিনা পয়সায় খাবার নিতে বাধ্য হয় গেরিলা বাহিনী, কারণ টাকা থাকে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে সবসময় দিতে হবে কোন বণ্ড, প্রমিসরি নোট, অন্তত কিছু একটা যা দিয়ে ধার স্বীকার করা যায়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে 'আশার বন্ড' নিয়ে। এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা উচিত মুক্তাঞ্চলের বাইরে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া উচিত। অন্ততপক্ষে ঋণের কিয়দংশ। যখন পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয় অর্থাৎ বিরুদ্ধ বাহিনীর শাসন থেকে কোন অঞ্চলকে স্থায়ীভাবে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়, তখন যৌথ কৃষিকাজ শুরু করা যায়, যেখানে কৃষকেরা গেরিলাবাহিনীর প্রয়োজনে চাষ করবে। এই উপায়ে পর্যাপ্ত এবং স্থায়ী খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা যায়।

যদি গেরিলাবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকদের বিরাট অংশের হাতে কোন অস্ত্র না থাকে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তারা শত্রু অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে বিদ্রোহী বাহিনী সরাসরি তাদের চাষের কাজে নিয়োগ করতে পারে।

এটা সরবরাহ নিশ্চিত করবে, উপরন্তু যোদ্ধাদের কাজের রেকর্ডে তার প্রতিফলন থাকবে যা তাদের ভবিষ্যত পদোন্নতির সোপান হিসাবে গণ্য হবে। এসব সত্ত্বেও, এটাই কাম্য যে কৃষকেরা তাদের নিজেদের শস্য বপন করুক, যাতে সে কাজটা সবচেয়ে ভালভাবে করা যায় উৎসাহ আর দক্ষতার সংমিশ্রণে। অবস্থার আরও উন্নতি হলে, কতটা শস্য হয়েছে তার নিরিখে বাহিনীর প্রয়োজনে সমস্ত চাষজাত দ্রব্য কেনা সম্ভব হতে পারে, যা মাঠে আছে অথবা গুদামজাত হয়েছে।

যখন কৃষকদেরও সরবরাহ করার জন্য কোন সংগঠন গড়ে তোলা যাবে, তখন সমস্ত খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্রীভূত করে কৃষকদের মধ্যে একটা পণ্য বিনিময় প্রথা চালু করা যেতে পারে, যার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করবে গেরিলা বাহিনী।

পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নতি হলে, করপ্রথা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, অবশ্যই তা যতটা সম্ভব কম হবে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর জন্য। কৃষকদের মধ্য থেকে উদ্ভূত গেরিলা বাহিনী ; তাই কৃষক শ্রেণী এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য।

কর সংগ্রহ করা যেতে পারে টাকায় অথবা ফসলের একটা অংশ হিসাবে, যা খাদ্য সরবরাহকে বাড়িয়ে তুলবে। মাংস একটা প্রাথমিক প্রয়োজনের জিনিস। তার উৎপাদন এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করা উচিত। অঞ্চলটি যদি সুরক্ষিত না হয়, কৃষকদের সঙ্গে গেরিলা বাহিনীর আপাত কোন সংযোগ না থাকে, তাহলে ফার্ম তৈরি করা যেতে পারে—যারা উৎপন্ন করবে মুরগী, ডিম, ছাগল, শূওর, যা কেনা যেতে পারে আবার বড় জমির মালিকদের থেকে বাজেয়াপ্ত করা যায়। গবাদি পশু বেশি সংখ্যায় মেলে বড় বড় খামারে—এগুলোকে মেরে, লবণ মাখিয়ে মাংসটা দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

এটা চামড়ার একটা উৎস হতে পারে। কমবেশি প্রাগৈতিহাসিক ধাঁচের একটা চর্মশিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে জুতোর জন্য চামড়ার যোগানের জন্য, এই জুতো হল লড়াইয়ের একটা মৌলিক সামগ্রী। সাধারণভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় খাবার (অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল) হল —মাংস, লবণ, সব্জী, কার্বোহাইড্রেট আর শস্য। মূল খাবার উৎপাদন করবে কৃষকরা ; কিউবার পার্বত্য ওরিয়েন্তে প্রদেশে যেমন মালাঙ্গা, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা এবং পেরুতে পার্বত্য অঞ্চলে যা আলু, আর্জেন্তিনাতে গোমাংস, অন্যান্য জায়গায় ময়দা। যাই হোক না কেন, প্রধান খাবারের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে বাহিনীর জন্য, এ ছাড়াও খাবার তৈরিতে সাহায্য করার জন্য কিছু চর্বি, সে প্রাণীজাত বা সব্জী থেকে প্রাপ্ত যাই হোক না কেন।

আর একটা খুব দরকারী জিনিস হচ্ছে লবণ। সমুদ্রের কাছাকাছি থাকলে, ছোট ছোট যন্ত্রের সাহায্যে তা সহজেই পাওয়া যায়। এভাবে উৎপাদন করে লবণের একটা সঞ্চয় গড়ে তোলা যায়, অন্য দলকে সরবরাহ করাও যায়। মনে রাখা দরকার, বন্ধুর অঞ্চলে যেখানে কেবলমাত্র কিছু খাবার উৎপাদন হয় সেই জায়গাটায় শত্রুদের অবরোধের ফলে সরবরাহ প্রবাহ ব্যবস্থাটার ক্ষতি হয়। এই ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে

যাতে কৃষককুল এবং নাগরিক সংগঠনগুলি এই অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে। অঞ্চলের অধিবাসীদের হাতে ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহ থাকা উচিত যাতে লড়াইয়ের সর্বাপেক্ষা কঠিন সময়েও তারা অন্তত জীবনধারণ করতে পারে, যদিও দরিদ্রের মত। দ্রুততার সঙ্গে যাতে একটা ভাল পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান করা যায় তার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে দেখতে হবে, তা যেন নষ্ট না হয়ে যায়—শস্য, গম, চাল ইত্যাদি যা অনেকদিন পর্যন্ত রাখা যায় ;এছাড়াও ময়দা, লবণ, চিনি এবং সব ধরনের টিনজাত দ্রব্য। প্রয়োজনীয় বীজও বপন করতে হবে।

এমন একটা সময় আসবে যখন এলাকায় বাহিনীর খাদ্য সমস্যা মিটে যাবে, কিন্তু বৃহৎ পরিমাণে অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন থেকেই যাবে : যদি এলাকায় সরবরাহের জন্য কোন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে জুতো, পোষাকের জন্য কাপড় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস ; সংবাদপত্রের জন্য একটা প্রেস মেশিন, কালি, এছাড়াও আরও অনেক কিছু। গেরিলা দল যত সংগঠিত হবে এবং সংগঠনটি যত জটিল হবে, ততই বাইরে থেকে আসা পণ্যদ্রব্যের প্রয়োজন বাড়বে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে মিটাতে গেলে সংগঠিত সরবরাহ লাইনকে ভাল করে কাজ করতে হবে। এইসব সংগঠনগুলো মূলত তৈরি করা হয় বন্ধুভাবাপন্ন কৃষকদের নিয়ে তাদের দুটো প্রান্ত থাকা উচিত, একটা গেরিলা এলাকায় আর একটা শহরে। গেরিলা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে সরবরাহ লাইনগুলো ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র এলাকায়, যা বিভিন্ন দ্রব্য আনার পথ করে দেবে। আস্তে আস্তে কৃষকরা ধাতস্থ হয়ে যাবে বিপদের সঙ্গে (ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা দারুণ কাজ করবে) এবং চূড়ান্ত বিপদের ঝুঁকি এড়িয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় তারা দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে এসে জমা করবে। এলাকাবিশেষে এইসব বরাতগুলো নিয়ে যাওয়া হয় রাত্রিতে খচ্চর বা ঐ ধরনের কোন ভারবাহী প্রাণীর পিঠে চড়িয়ে বা কোন ট্রাকে করে। এভাবে বেশ ভাল সরবরাহ পাওয়া যায়। এই ধরনের সরবরাহ লাইন যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এলাকার জন্য।

দূরবর্তী এলাকাতেও একটা সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার, যারা কেনাকাটার জন্য দরকারী টাকা যোগাবে, ছোট শহরে বা প্রাদেশিক শহরগুলিতে যা উৎপন্ন হয় না, তা-ও পাঠানোর ব্যবস্থা করবে সংগঠনকে সাহায্য করার জন্য। সমাজের যেসব অংশ লড়াইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের থেকে সরাসরি দান গ্রহণ করা হবে, বিনিময় করা যেতে পারে বণ্ডের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থাটা পরিচালনার দায়িত্বে যে থাকবে তাকে সবসময় কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী হতে হবে। এই দায়িত্বে কোনরকম নৈতিক স্খলন হলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। যখন গেরিলাবাহিনী তাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে নতুন এলাকায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, তখন কেনাকাটা নগদে অথবা 'আশার বণ্ডে'র মাধ্যমে করা যাবে। এইসব পরিস্থিতিতে মালিকদের কাছ থেকে পণ্য নিতেই হবে, তাদেরও গেরিলাদের প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের ধার শোধ দেওয়ার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

সরবরাহ যেসব পথ দিয়ে যায়, তার আশেপাশে বেশ কিছু বাড়ি, অথবা অন্য

ধরনের কিছু ঘাঁটি থাকা দরকার, যখন রাত্রি আসার অপেক্ষায় দিনের বেলা পণ্যদ্রব্যগুলি লুকিয়ে রাখা যায়। যারা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তাদেরই গোচরে থাকবে এই বাড়িগুলি। যত কম সম্ভব স্থানীয় অধিবাসী জানবে এই পরিবহন সম্পর্কে, যাদের উপর সংগঠনের থাকবে অগাধ আস্থা।

এই কাজের সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম হল খচ্চর। অসাধারণ শ্রান্তিহীনতা আর ভয়ঙ্কর খাড়াই অঞ্চলেও চলতে অভ্যস্ত এই প্রাণীটি দিনে ১০০ কিলোগ্রামের বেশি ভার বইতে পারে। খাবার প্রয়োজনও তাদের খুব কম, তাই সরবরাহের কাজে এ হল আদর্শ প্রাণী। এদের পায়ের নাল ঠিকমত যোগান দিতে হবে এবং তাদের দেখাশোনা করবে যারা, তারা যেন প্রাণীগুলিকে বোঝে এবং তাদের যত্ন নেয়। এভাবেই যাদের কার্যকারিতা অবিশ্বাস্য, সেই চারপেয়ে প্রাণীদের নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু খুব কঠোর সময়ে যাতায়াত করার জন্য শক্তি সামর্থ্য থাকলেও প্রায়ই পথের অসুবিধায় মালপত্র কোন নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য একটা বিশেষ দলকে প্রাণীগুলির যাতায়াতের পথ অনুসরণ করতে হবে। এই সমস্ত শর্তগুলি পূরণ হলে, যদি ঠিকমত সংগঠন তৈরি করা যায় এবং বিদ্রোহী বাহিনী যদি কৃষকদের সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, বাহিনীর জন্য একটা কার্যকরী এবং দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

২. অসামরিক সংগঠন

বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যন্তর এবং বহিস্থ দুই ফ্রন্টেই অসামরিক সংগঠন তৈরি করা প্রয়োজনীয়। স্বভাবতই তাদের প্রকৃতি এবং কার্যপ্রণালী দুটোই হবে পৃথক, যদিও তারা কাজ করবে এই নামের অধীনে। উদাহরণস্বরূপ গেরিলা অঞ্চলের বাইরে যে সাহায্য সংগ্রহ করা হয় তার প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ অঞ্চলের থেকে পৃথক, যার বেশিরভাগটা যায় প্রচার এবং সরবরাহ বাবদ। আভ্যন্তরীণ ফ্রন্টের কাজকর্ম নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

আভ্যন্তরীণ ফ্রন্ট বলতে আমরা বুঝি একটা অঞ্চল যা মূলত মুক্তিফৌজের অধীনে। এ ছাড়াও মনে করা হয় যে অঞ্চলটি গেরিলাযুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত। অন্য কথায় বলতে গেলে, যখন গেরিলারা একটা প্রতিকূল অঞ্চলে লড়াই করে, তারা সেখানে ঢুকতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের দখল দৃঢ় করতে পারে না ; নতুন এলাকার ভিতর দিয়ে তারা প্রবেশ করার পথ সৃষ্টি করে, কিন্তু কোন আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না কারণ পুরো অঞ্চলটাতে থাকে শত্রুর দখলদারি। আভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে আমাদের একগুচ্ছ সংগঠন থাকে যারা প্রশাসনিক দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। সাধারণত, প্রচার ব্যাপারটা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে গেরিলা সৈন্যবাহিনী, কিন্তু তাও গেরিলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্য কারও হাতে দেওয়া যায়। (এই ব্যাপারটা

এত জরুরী যে অন্য কোথাও এ ব্যাপারে আলোচনা করব।) সাহায্য বা চাঁদা সংগ্রহ অসামরিক সংগঠনের একটি কাজ, আরও একটি সাধারণ কাজ কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠিত করা। এই দুটো কাজই করা যায় একটা কাউন্সিলের মাধ্যমে।

আগের অধ্যায়ে আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, সাহায্য সংগ্রহের কাজটা বিভিন্ন উপায়ে করা যায় : প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অনুদানে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ; এর একটা বড় অংশই চলে যায় গেরিলা সৈন্যবাহিনীর রসদ সংগ্রহে।

এটা মাথায় রাখতে হবে যে বিদ্রোহী বাহিনীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের ফলে যেন দারিদ্র্য বেড়ে না যায়, শত্রুর অবরোধের ফলেও পরোক্ষে দায়ী করা হয় তাদের। বিরুদ্ধ প্রচারে বারে বারে তাদের কোনঠাসা করা হয়। ঠিক এইসব কারণেই সরাসরি কখনও কারও সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। যেমন, এমন কোন আইন থাকা উচিত নয় যে, কৃষকরা মুক্ত অঞ্চলের বাইরে তাদের উৎপাদন বিক্রী করতে পারবে না, অবশ্য চূড়ান্ত এবং ক্ষণস্থায়ী পরিস্থিতিতে আলাদা কথা, তখন কৃষক সমাজের কাছে যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে হবে এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের জন্য। গেরিলা বাহিনীর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গী হওয়া উচিত উপযুক্ত ব্যাখ্যাসহ প্রচারের। কৃষকদের মধ্যে যাদের পিতা, ভাই অথবা আত্মীয়-স্বজনেরা বাহিনীতে আছে, তারা সহজেই বুঝে যায় সবকিছু, কারণ এটা তাদেরই বাহিনী মনে করে তারা।

কৃষক সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্ব বিচার করে সংগঠনগুলি সৃষ্টি করা উচিত তাদের নিজেদের জন্য নিয়মাবলী তৈরি করার জন্য। এই সংগঠনগুলি যে কেবলমাত্র মুক্ত অঞ্চলেই থাকবে তা নয়, তাদের সংযোগ থাকবে পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও আর এই সংগঠনগুলির মাধ্যমেই গেরিলা ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ বিস্তৃতির জন্য অন্য অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। কৃষকেরা আন্দোলনের বীজ বপন করবে মৌখিক এবং লিখিত প্রচারের মাধ্যমে, এই প্রচারের মধ্যে থাকবে অন্য এলাকায় (মুক্তাঞ্চলে) জীবনের কথা, ক্ষুদ্র চাষীদের রক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যেই যে সব আইন পাশ হয়েছে, বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর মানসিকতা এবং আত্মত্যাগের কথায়, এক কথায় বিদ্রোহী বাহিনীকে সাহায্যের জন্য তারা একটা আবহাওয়া তৈরি করবে।

কৃষক সংগঠনগুলির এমন সংযোগ থাকা উচিত যার মাধ্যমে শত্রু অঞ্চলে বিদ্রোহী বাহিনীর সমন্বয় ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে কৃষকশ্রেণীর প্রতি মোটামুটি বন্ধুভাবাপন্ন মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তায় তাদের শস্য পরিবহন এবং বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারে। ব্যবসায়ী একটা ভাল কাজের সমর্থন করার জন্য ঝুঁকি নিতে পারে, আবার টাকাটাও তার দরকার ; অর্থ লাভের জন্য যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করতে পারে।

আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি সরবরাহ সমস্যার সঙ্গে জড়িত রাস্তা নির্মাণ বিভাগের গুরুত্বের কথা। যখন গেরিলা দলটি উন্নয়নের একটা নির্দিষ্ট মান অর্জন করে, তখন তার কমবেশি চার-পাঁচটা স্থায়ী কেন্দ্র থাকতে পারে এবং তারা শিবির ছাড়া যত্রতত্র আর ঘুরে বেড়াবে না। একটা খচ্চর যাতায়াত করার মত ছোট্ট একফালি রাস্তা থেকে ট্রাক যাবার মত ভাল রাস্তা সবই নির্মাণ করতে হবে। যাই করা হোক না কেন,

বিদ্রোহী বাহিনীর সংগঠনের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর আক্রমণ ক্ষমতা, যারা এই নির্মাণ কাজগুলিকে ধ্বংস করে দিতে পারে, এমনকি তাদের প্রতিপক্ষের দ্বারা তৈরি করা রাস্তাগুলো ব্যবহার করে তাদের শিবিরে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে কিনা, এসব ব্যাপারই মাথায় রাখতে হবে। এটা একটা অবশ্যপালনীয় নিয়মের মত মানতে হবে যে যেখানে আর কোন সমাধান সম্ভব নয় কেবল সেখানেই সরবরাহ ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য রাস্তা তৈরি করা দরকার, কিন্তু যেখানে একটা বিরুদ্ধ আক্রমণে তা ধ্বংস হবার আশঙ্কা আছে, সেখানে এ ধরনের নির্মাণের পরিকল্পনা ত্যাগ করা উচিত। অবশ্য এমন দুটি অঞ্চল যার তেমন কোন গুরুত্ব নেই, সেখানে দুটি প্রান্তদেশের মধ্যে সংযোগের জন্য রাস্তা তৈরি করতে ঝুঁকি নেই।

এছাড়াও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে টেলিফোন, বনের মধ্য দিয়ে তার লাইন নিয়ে যেতে হবে, গাছগুলিকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। ওগুলিকে শত্রুরা ওপর থেকে দেখতে পায় না। টেলিফোন ব্যবস্থা প্রবর্তন মানে ঐ অঞ্চলে শত্রু অনুপ্রবেশ করতে পারে না।

কাউন্সিল অথবা বিচার, বিপ্লবী আইন এবং প্রশাসন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় বিভাগ হচ্ছে একটি পূর্ণ বিকশিত গেরিলা সৈন্যবাহিনীর বিশিষ্ট অঙ্গ। কাউন্সিলের নেতৃত্ব দেবে এমন একজন ব্যক্তি যার দেশের আইন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আছে, আরও ভাল হয় যদি সে (মহিলা বা পুরুষ) ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনীয়তাটা বোঝে, একগুচ্ছ ডিক্রী এবং আইনের খসড়া তৈরি করে সে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাবে যা বিদ্রোহী অঞ্চলে কৃষকদের জীবনকে স্বাভাবিক ও নিয়মানুগ করতে সাহায্য করবে।

উদাহরণস্বরূপ, কিউবার যুদ্ধ চলাকালীন আমরা একটি পেনাল কোড, সিভিল কোড, জনগণকে সরবরাহের জন্য আইন এবং ভূমি সংস্কারের নীতি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী প্রণয়ন করেছিলাম। পরবর্তীকালে জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থীদের জন্য যোগ্যতামান সংক্রান্ত আইন পাশ হয়েছিল। সিয়েররা মায়েস্ত্রার ভূমি সংস্কার আইনও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কাউন্সিলের হাতে ছিল গেরিলা কলামগুলির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতা, এর দায়িত্ব ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের এবং মাঝে মাঝে এই কাউন্সিল সরবরাহের ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করত।

কোন বিশেষ জায়গার অভিজ্ঞতা, তার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে এই সমস্ত সুপারিশগুলি হবে নমনীয়, বিভিন্ন ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে সেগুলি পরিবর্তন করা যাবে।

কাউন্সিলের পাশাপাশি, এলাকার সাধারণ স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, এর জন্যে কেন্দ্রীয় সামরিক হাসপাতালের কথা চিন্তা করা যেতে পারে যা কৃষকদের পূর্ণ যত্ন নেবে। বিপ্লব কোন্ স্তরে পৌঁছেছে তার উপর নির্ভর করে উপযুক্ত ডাক্তারী চিকিৎসা দেওয়া যাবে কি না। অসামরিক হাসপাতাল এবং অসামরিক স্বাস্থ্য প্রশাসনে অফিসার ও বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দুটি ভূমিকা থাকে, (এক) জনসাধারণকে যত্ন করা, (দুই) তাদের দেখানো কেমন করে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এই স্বাস্থ্য

প্রতিষ্ঠানগুলির সরাসরি সংযোগ থাকবে গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নীতিগুলির প্রতি অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রধান সমস্যাগুলি এবং যে নরকে তারা বাস করে তা এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে।

কর সংগ্রহও জেনারেল কাউন্সিলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গুদামঘর তৈরি করাটা খুব দরকারি। কোন জায়গা দখলের সাথে সাথে যদি দেখা যায় সেটি গেরিলা ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে তবে যত সুশৃঙ্খলভাবে সম্ভব গুদামঘর তৈরি করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে জিনিসপত্রের ন্যূনতম যত্ন, এবং খাদ্যদ্রব্যের সমবন্টন।

গেরিলা এলাকার বাইরের ফ্রন্টের কাজকর্ম গুণগত এবং সংখ্যাগত দিক থেকে আলাদা। উদাহারণস্বরূপ প্রচারের থাকবে একটা জাতীয় প্রেক্ষাপট, গেরিলাদের জয়লাভ ব্যাখ্যা করতে হবে, শ্রমিক কৃষকদের কার্যকরী আন্দোলন করার ডাক দিতে হবে, জয়ের যে কোন সংবাদ পৌঁছতে হবে সব ফ্রন্টে। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপনে করতে হবে, সম্ভাব্য সব সতর্কতা নিয়ে সে কাজটা করতে হবে, সংস্থার কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে ছোট ছোট দান সংগ্রহকারীদের দূরত্ব বজায় থাকবে।

এই সংগঠনগুলিকে সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে যারা একে অন্যের পরিপূরক, যাতে একটা সমগ্র অঞ্চল গড়ে তোলা যায় : আন্দোলনের বহরের উপর নির্ভর করে অঞ্চলগুলি হতে পারে প্রদেশ, শহর বা গ্রাম। প্রত্যেক সংগঠনের একটা অর্থনৈতিক কমিশন গোছের থাকবে যারা সংগৃহীত তহবিলের সুষ্ঠু বন্টনের দায়িত্বে থাকবে। বণ্ড বিক্রী করে বা সরাসরি চাঁদা গ্রহণ করে টাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন কর আদায়ও করা যায়, শিল্প সংস্থাগুলো যখন বিদ্রোহী বাহিনীকে একটা বড় ধরনের শক্তি হিসাবে দেখে, তারা টাকা দিতে রাজী হয়। গেরিলাদলের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ সংগ্রহ করতে হয় ;একটা সরবরাহ চেন গড়ে তুলতে হবে যাতে সাধারণ জিনিসগুলো কাছাকাছি সংগ্রহ করা যায়, যে জিনিসগুলো সহজলভ্য নয় এবং স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না, তার জন্য বাইরের বড় বাজারে যেতেই হবে। প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে চেনটা যথাসম্ভব সীমিত রাখা যায়, এর কথা যেন খুব অল্পসংখ্যক লোকই জানে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বাইরের এলাকার অসামরিক সংগঠন অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম করবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে, ব্যক্তি হত্যার পথ নিতে হতে পারে, সাধারণভাবে আমাদের কাছে এটা কাম্য নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে জনগণের বিরুদ্ধে কর্মরত কিছু কুখ্যাত লোক যখন অত্যাচার চালিয়ে যায় তখন তাকে সরিয়ে দিতেই হবে। কিউবার বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি আমাদের অনেক উৎকৃষ্ট কমরেডের জীবন আমরা বাঁচাতে পারতাম যারা তুচ্ছ কারণে তাদের জীবন বলি দিয়েছে। কখনও কখনও শত্রুর প্রতিহিংসামূলক বুলেট অনেক যোদ্ধার জীবন কেড়ে নিয়েছে, যা বাস্তবে হওয়া উচিত ছিল না। নির্বিচার হত্যা ও সন্ত্রাস কখনই কাম্য নয়। বেশি করে চেষ্টা চালানো উচিত এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ যাতে প্রোথিত করা যায়, যাতে সংকটজক মুহূর্তে তারা সংঘবদ্ধ হতে পারে

এবং অস্ত্রশক্তির সাহায্যে, বিপ্লবের সমর্থনে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।

এর জন্যে দরকার শ্রমিক, কৃষক এবং পেশাদার ব্যক্তিদের জনপ্রিয় সংগঠন যারা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করবে, বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করে, বাস্তব সত্য শেখানোর জন্য বিপ্লবী প্রকাশনা প্রচার করে। বিপ্লবী প্রচারের একটি প্রধান বিষয় হল সত্যনিষ্ঠতা। এইভাবেই ধীরে ধীরে জনগণকে জয় করা যায়। যারা দারুণ কাজ করবে তাদের বিদ্রোহী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে অথবা আরও বড় কোন দায়িত্ব অর্পণ করা যায়।

গেরিলা অঞ্চলের ভিতরে এবং বাইরে জনযুদ্ধের সময় এই হল অসামরিক সংগঠনের রূপরেখা। যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উন্নতি ঘটানোর। আমি আবার বলছি, আমি সব কিছু আলোচনা করছি কিউবাতে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এর থেকে আলাদা হতে পারে এবং এইসব ধারণাকে উন্নত করতেও পারে। আমরা একটা রূপরেখা হাজির করেছি, একে ধ্রুবসত্য হিসাবে গ্রহণ করতে বলছি না।

৩. নারীর ভূমিকা

বিপ্লবী পরিস্থিতির উন্নয়নে নারী যা ভূমিকা পালন করতে পারে তার অসাধারণ গুরুত্ব আছে। এই ব্যাপারটায় জোর দিতে হবে, কেননা সমস্ত দেশে, ঔপনিবেশিক মানসিকতার শিকার হয়ে নারীর ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতই একটা বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়।

মহিলারা সবচেয়ে কঠিন কাজ করার ক্ষমতা রাখে, পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে পারে, এবং প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধিতা করে তারা কখনোই বিপ্লবী বাহিনীর অভ্যন্তরে যৌন সম্পর্কে কোন বাদবিতন্ডা সৃষ্টি করে না, যদি আদর্শগত এবং সাংগঠনিক ভিত্তিটা দৃঢ় থাকে।

একজন যোদ্ধার কঠোর কঠিন জীবনে নারী এক সঙ্গিনী যে তার মহিলা সুলভ গুণাবলী নিয়ে কাজ করতে পারে, কিন্তু সে পুরুষের সমানই কাজ করে এবং সে লড়াই করতেও পারে। সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হতে পারে, কিন্তু কখনই পুরুষের থেকে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা কম নয়। একটি মানুষ যতটুকু উজাড় করে দিতে পারে লড়াইয়ের ময়দানে, মহিলারা কিছু কম যায় না তাতে এবং কিউবার সংগ্রামে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সেবার কাজও করেছে।

স্বভাবতই মহিলা যোদ্ধারা সংখ্যালঘু। যখন আভ্যন্তরীণ ফ্রন্ট দৃঢ়বদ্ধ হয়, যে সমস্ত যোদ্ধার শারীরিক সক্ষমতা নেই, তাদের সরিয়ে নেওয়া উচিত; সেই সময়ে মহিলাদের বিশেষ কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজনটি হচ্ছে বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ, বিশেষ করে যারা শত্রু অঞ্চলে আছে।

জিনিসপত্র, সংবাদ বা টাকা যা ছোটখাট জিনিস কিন্তু তার গুরুত্ব অপরিসীম এমন জিনিস পরিবহনের কাজ দেওয়া উচিত সেই সমস্ত মহিলাদের যাদের উপর গেরিলা বাহিনীর পূর্ণ আস্থা আছে ; মেয়েরা বহু ধরনের কৌশলের সাহায্য নিয়ে পরিবহনকারিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা সত্য যে, নিপীড়ন যত নিষ্ঠুরই হোক, যতই তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াক শত্রুরা, নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম কঠিন ব্যবহার পেয়ে থাকে, আর তার জন্য অনেক সহজে গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় নথি অথবা জিনিস পৌঁছে দিতে পারে গন্তব্যে।

লিখিত অথবা মৌখিক সংবাদ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ সংবাদবাহক হিসাবে মহিলারা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে ; কারণ তাদের প্রতি অত কঠোর দৃষ্টি থাকে না, শত্রুসৈন্য তাদের অতটা বিপজ্জনক মনে করে না। ভীত হয়ে অথবা নিজে আক্রান্ত হবার ভয় থেকেই শত্রুসৈন্য নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়, কারণ গেরিলাযুদ্ধের নীতিই হল চকিত আক্রমণ।

মেয়েরা তাদের স্কার্টের তলায় বিশেষ ধরনের বেল্ট পরতে পারে যার ভিতরে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে যে সংবাদ আদান প্রদান হয়, দেশের ভিতরে এমনকি দেশের বাইরেও এবং ছোট আকারের জিনিস, যেমন বুলেট বহন করতে পারে। সচরাচর শান্তির সময়ে তাদের যে ভূমিকা তাও পালন করতে পারে মেয়েরা। চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থায় বাস করতে থাকা একজন গেরিলা যোদ্ধা সুস্বাদু খাবার আস্বাদন করতে পারে এই মহিলাদের সৌজন্যে (যুদ্ধের একটা বড় অত্যাচার হচ্ছে ঠাণ্ডা, আঠালো, বিস্বাদ খাবার খাওয়া দিনের পর দিন)। একজন মহিলা রাঁধুনী খাবারের গুণগত মান পরিবর্তন করে দিতে পারে সহজেই ; গার্হস্থ্য কাজগুলোতেই তারা অনেক স্বচ্ছন্দ। গেরিলা দলগুলির একটা সমস্যা হল, তারা অসামরিক কাজগুলি অবজ্ঞা করে, এইসব কাজগুলি থেকে মুক্তি পেয়ে তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালায় সক্রিয় যোদ্ধাদের দলে যোগ দিতে।

মহিলাদের একটা বড় কাজ হল মূলত এলাকার কৃষকদের পড়তে শেখানো, বিপ্লবী তত্ত্বসহ, শুধু তাদেরই নয়, বিপ্লবী যোদ্ধাদেরও। অসামরিক সংগঠনের একটা অংশ হল স্কুল গড়ে তোলা, যার মূল দায়িত্ব দেওয়া উচিত মহিলাদের, যারা শিশুদের মধ্যে আরও বেশি করে উৎসাহ জাগিয়ে তুলবে স্নেহ ভালবাসার মাধ্যমে। যখন গেরিলা ফ্রন্টগুলি মজবুত হয় তখন সমাজ সংস্কারের কাজটাও বর্তায় মহিলাদের উপর, যারা এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্যায় অবিচারের ব্যাপারে তদন্ত করেন এবং যতদূর সম্ভব সেগুলি নির্মূল করতে চেষ্টা করেন।

চিকিৎসার ব্যাপারে নার্স হিসাবে, এমনকি ডাক্তার হিসাবে রুক্ষ সশ্রদ্ধ যোদ্ধাদের চেয়ে অনেক বেশি ভদ্রভাবে কাজ করতে পারে মহিলারা। যখন একজন অসহায়, আরামহীন, সম্ভবত ভয়ানক যন্ত্রণায় কাবু এবং আনুষঙ্গিক বহুরকম ঝুঁকি নেওয়া যোদ্ধা একজন সুভদ্র মহিলার সামনাসামনি হয়, তার অনুভূতিও হয়ে যায় কোমল।

যখন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের শিল্প গড়ে তোলা হয়, মহিলারা, এমন কী ইউনিফর্ম তৈরি করতে পারে; লাতিন আমেরিকায় মহিলাদের যা এক চিরাচরিত কাজ।

একটামাত্র সেলাই মেশিন এবং কতকগুলি নকসা নিয়ে তারা অসাধ্যসাধন করতে পারে। অসামরিক সংগঠনের সর্বস্তরে, তারা পুরুষদের পরিবর্তে জায়গা নিতে পারে এবং অস্ত্রও হাতে তুলে নিতে পারে, যদিও গেরিলা জীবনে এটা একটা কদাচিৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা।

পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই সঠিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে বাহিনীর নীতিবোধ ধাক্কা খায় এমন কাজ কেউ না করে। কিন্তু যদি কোন নারী এবং পুরুষ ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরকে ভালবাসে, তবে তাদের বিবাহ করতে অনুমতি দেওয়া উচিত। তারা স্বামী স্ত্রী হিসাবে পাহাড়ে থাকতেই পারে, গেরিলা বাহিনীর সহজ কিছু বিধি মেনে।

৪. স্বাস্থ্য

গেরিলা যোদ্ধার সমস্যাগুলির একটি হল জীবনের দুর্ঘটনাগুলির মোকাবিলা করা, বিশেষ করে আহত বা অসুস্থ হওয়া যা আকছার ঘটে তাদের জীবনে। তাই গেরিলাদের বাহিনীতে ডাক্তারের ভূমিকা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ; শুধুমাত্র লোকের জীবন বাঁচানো নয়, কারণ সীমাবদ্ধ জিনিসপত্র নিয়ে তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না, কিন্তু ডাক্তার রুগীকে নৈতিকভাবে চাঙ্গা করে তোলে এবং তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, তার দোরগোড়ায় কেউ না কেউ আছে যে তার যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করছে। ডাক্তার অসুস্থ বা আহত রুগীকে অন্তত এটুকু স্বস্তি দিতে পারে যে, যতদিন না তারা ভাল হচ্ছে অথবা বিপন্মুক্ত হচ্ছে, ততদিন কেউ না কেউ তার পাশে আছে।

কেমন হাসপাতাল গড়ে উঠবে সেটা পুরোপুরি নির্ভর করবে গেরিলা বাহিনীর বিকাশের উপর। বিভিন্ন স্তরে তিন ধরনের হাসপাতাল সম্পর্কে বলা হয়েছে।

প্রথমে যাযাবর অবস্থায়—যদি কোন ডাক্তার থাকে, সে সব সময় সাথীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, একজন অতিরিক্ত লোক হিসাবে, সে পুরুষ বা মহিলা যাই হোক, সম্ভবত তাকে অন্যান্য গেরিলা যোদ্ধাদের মত সব কাজই করতে হবে, এমনকি লড়াইও এবং মাঝে মাঝে জীবন বাঁচানোর পর্যাপ্ত সামগ্রী না থাকা সত্ত্বেও রুগীদের চিকিৎসার জন্য দুঃসাধ্য কাজ করতেও হবে। এই একটা সময় যখন বাহিনীর উপর ডাক্তারের একটা বিরাট প্রভাব কাজ করে, তাদের নীতিবোধের উপরে তো বটেই। গেরিলা বাহিনীর এই বিকাশের মুহূর্তে ডাক্তারকে দেখা হয় এক পাদ্রীর মত, যে গেরিলাদের কাছে সান্ত্বনার প্রতীক। ঘোরতর অসুস্থতার সময় একটা সামান্য এ্যাসপিরিনের হয়তো কোন কাজ নেই, কিন্তু তার ভোগান্তিটাকে নিজের মনে করে যে তার কপালে সান্ত্বনার হাত রাখে তার মূল্য যথেষ্ট। তাই, প্রথম পর্যায়ে ডাক্তার হবে এমন এক ব্যক্তি যে বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে একাত্মবোধ করে, কেননা অন্য সদস্যদের চেয়ে তার কথার প্রভাব দলের মধ্যে অনেক বেশি।

সাধারণভাবে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ এমন এক স্তরে পৌঁছায় যাকে বলা যায় আধা যাযাবর। তখন শিবির তৈরি হয়, প্রায়ই গেরিলারা সেখানে এসে থাকে, এছাড়াও কিছু বন্ধুভাবাপন্ন পরিবারের বাড়ি, যেখানে জিনিসপত্র রাখা যায়, এমনকি আহত সৈন্যদের পর্যন্ত, গেরিলাবাহিনীর মধ্যে একটা স্থায়ী হবার প্রবণতা দেখা যায়। এমতাবস্থায়, ডাক্তারের কাজটা কম হতাশাব্যঞ্জক হয়, তার হয়তো জরুরী অস্ত্রোপচারের জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি আছে এবং কোন বন্ধুভাবাপন্ন বাড়িতে কম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনও করা যেতে পারে। অসুস্থ এবং আহতদের কৃষকদের বাড়িতে রাখা হয়, তারা প্রবল নিষ্ঠার সাথে ওদের দেখভাল করে। ডাক্তারও তার প্রয়োজনীয় ঔষধগুলো সুবিধাজনক জায়গায় রাখতে পারে, যতদূর সম্ভব তার একটা তালিকা রাখা দরকার, পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী এই আধা-যাযাবর অবস্থায় গেরিলা দলকে যদি দুর্ভেদ্য জায়গায় কাজ করতে হয়, তাহলে, আহত ও অসুস্থদের জন্য নিরাপদ জায়গায় হাসপাতাল তৈরি করতে পারে।

তৃতীয় ধাপে, যখন এলাকাগুলি শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকে, একটা সত্যিকারের হাসপাতাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এই উন্নত অবস্থায় তিনটি বিভিন্ন প্রকারের কেন্দ্র থাকতে পারে। যোদ্ধাদের মধ্যে একজন ডাক্তার থাকা উচিত, তাকে বাহিনীর সবাই ভালবাসবে। তাদেরই মত সে যোদ্ধা কিন্তু তার গভীর জ্ঞানের দরকার নেই। একথা বলছি এই কারণে যে তার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে আহত বা অসুস্থের কষ্ট উপশম করা। আসল চিকিৎসার কাজটা নিরাপদে করা হয় হাসপাতালে। একজন ভাল সার্জনকে গুলির মুখে ফেলে দেওয়া যায় না।

যুদ্ধক্ষেত্রের সামনের সারিতে যখন কোন যোদ্ধা আহত হয়, সংগঠনের অবস্থা অনুযায়ী যদি কোন স্ট্রেচারবাহক থাকে, তবে তারা তাকে নিয়ে যাবে প্রথম ঘাঁটিতে। যদি এরকম কেউ না থাকে, তাহলে সহযোদ্ধারাই এই দায়িত্ব পালন করবে। বন্ধুর-রাস্তায় আহতদের বয়ে নিয়ে যাওয়া একটা দুরূহ কাজ এবং একজন যোদ্ধার জীবনে তা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। তার চাইতেও সহযোদ্ধাদের কাছে তা আরও প্রণান্তকর। কেবল আত্মত্যাগের আদর্শে তারা এই কাজ করে দেয়। অঞ্চল বিশেষে যানবাহনও বিভিন্ন হয়। এবড়ো খেবড়ো জঙ্গল এলাকায়, যা নাকি গেরিলা যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী, নিজেকেই হেঁটে হেঁটে যেতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হল একটা লম্বা লাঠি থেকে হ্যামক টাঙিয়ে দেওয়া, যাতে করে সহযোদ্ধারা তাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পালা করে একজন সামনে, একজন পিছনে বয়ে নিয়ে যায়। আরও দুই বন্ধুর সঙ্গে তারা মাঝে মাঝে পাল্টাপাল্টি করে নেয়, কারণ তাদের কাঁধটা অসম্ভব ভারী হয়ে ওঠে খানিকটা পরপরই।

প্রথম হাসপাতালে পরীক্ষা হবার পর আহত সৈন্যটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিয়ে যাওয়া হয় দ্বিতীয় কেন্দ্রে, যেখানে সম্ভবত সার্জেন এবং বিশেষজ্ঞরা থাকবেন, অবশ্যই গেরিলাবাহিনীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে তা। সেখানে অপারেশনের অনেক

বেশি সুযোগ থাকে। জীবনের বিপদটা কম হয়। তৃতীয় ধাপে, আরও ভাল হাসপাতাল থাকবে, যেখানে এলাকার জনসাধারণের অসুখের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কারণ অনুসন্ধানের অনেক সুযোগ থাকবে। এই হাসপাতালগুলি যে কেবল স্বাস্থ্য রক্ষার দাওয়াইগুলি দেয় তাই নয়, অসামরিক লোকজনকে সেবাও করে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সেখানে শিক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তিগত চিকিৎসার সুবিধার্থে ঔষধের দোকান খোলার ব্যবস্থা করা উচিত। অসামরিক সংগঠনের সরবরাহে যদি প্রাচুর্য থাকে, তাহলে এই তৃতীয় স্তরের হাসপাতালগুলিতে অনেক ধরনের সুযোগসুবিধা দেওয়া যায়, যেমন রোগনির্ণয়, এমনকি ল্যাবরেটরী এবং এক্স-রে সুবিধা।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হল ডাক্তারের সহকারীরা। তারা হবে সাধারণত যুবক, চিকিৎসা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকবে তাদের, ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। তারা অস্ত্র বহন করবে না ; শুধু যে তাদের পেশা ডাক্তারী তা বলে নয়, এটাও একটা কারণ যে, সবাইকে দেওয়ার মত অস্ত্রের অপ্রতুলতা। যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয়, তবে এই সমস্ত সহকারীরা সমস্ত ঔষধপত্র বহন করবে, একটা অতিরিক্ত স্ট্রেচার অথবা একটা হ্যামক। যে কোন যুদ্ধে তারা আহতদের দায়িত্ব নেবে।

শত্রু অঞ্চলের স্বাস্থ্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধগুলো নিয়ে আসতে হবে। কখনও কখনও কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন, যেমন, রেডক্রশ ইত্যাদি থেকেও পাওয়া যায় ঔষধ। কিন্তু বিশেষ করে, লড়াইয়ের শুরুর দিকে সেটা সম্ভব নয়। এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যাতে বিপদের সময় দ্রুত ঔষধ নিয়ে আসা যায় এবং সমস্ত হাসপাতালগুলিতে, সে সামরিক বা অসামরিক যাই হোক না কেন, তাদের দরকারী কাজের জন্য সেগুলি সরবরাহ করা যায়। এ ছাড়াও, আশপাশের এলাকার ডাক্তারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে যাতে তারা আহতদের সাহায্য করতে পারেন, বিশেষ করে যখন গেরিলা দলের ক্ষমতা বা সুযোগ সুবিধার বাইরে চলে যায় অবস্থাটা।

এই ধরনের যুদ্ধে যেসব ডাক্তার দরকার তাদের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধরনের। প্রথম ধাপে, গেরিলাদের সহযোদ্ধা ডাক্তার দরকার, তাদের কাজকর্ম বিকশিত হয় গেরিলা দলটি আরও ডালপালা ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এবং যখন আরও অনেক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এই সৈন্যবাহিনীর কাছে সাধারণ শল্য চিকিৎসক সবচেয়ে জরুরী। যদি একজন এ্যানাসথেসিষ্ট পাওয়া যায় তো খুব ভাল, যদিও প্রায় সব অপারেশনগুলিতে গ্যাস এ্যানসথেসিয়ার পরিবর্তে ল্যারগ্যাকটিল এবং সোডিয়াম পেনটোথাল ব্যবহার করা হয়, যেগুলো প্রয়োগ করাও সোজা, যোগাড় করা বা সংরক্ষণ করাও সহজতর। সাধারণ শল্য চিকিৎসক ছাড়াও হাড় বিশেষজ্ঞ (Bone Specialist) খুব দরকার, কারণ দুর্ঘটনার ফলে হাড় ভাঙার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। বেশিরভাগই হয় বুলেটের আঘাতে। ক্লিনিক বা স্বাস্থ্য নিকেতনগুলো প্রাথমিকভাবে কৃষকদের চিকিৎসা করে ; গেরিলাবাহিনীর সদস্যদের রোগ নির্ণয় করা সাধারণত সোজা। সবচেয়ে কষ্টকর কাজ হল অপুষ্টিজনিত সমস্যার চিকিৎসা করা।

আরও উন্নত অবস্থায়, যদি ভাল হাসপাতাল থাকে, সেখানে পুরো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ল্যাবরেটরি, টেকনিসিয়ানও থাকতে পারে। সমস্ত ক্ষেত্রের পেশাদারদের কাছে আবেদন করা উচিত ; এটা স্বাভাবিক যে অনেকে এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতে আসবেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত সব ধরনের পোশাদার মানুষকে দরকার—শল্য চিকিৎসক, আবার দন্ত চিকিৎসককেও। দাঁতের ডাক্তারদের খুব সরল যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে বলতে হবে, যার সাহায্যে বাস্তবে তারা সবরকম প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করতে পারেন।

৫. অন্তর্ঘাত

গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাছে অন্তর্ঘাত হল এক অমূল্য অস্ত্র। এর সংগঠন থাকে অসামরিক বা গুপ্ত শাখার অধীনে, কারণ সাধারণত অন্তর্ঘাত ঘটানো হয় বিপ্লবী বাহিনী অধিকৃত অঞ্চলের বাইরে ; কিন্তু এর নেতৃত্বে সরাসরি থাকবে গেরিলাবাহিনীর জেনারেল স্টাফ, যারা লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ শিল্প-সংস্থা, যোগাযোগ বা অন্য কোন স্থানে আক্রমণ করা হবে তার দায়িত্বে থাকবে।

অন্তর্ঘাতের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোন যোগ নেই। সন্ত্রাসবাদ এবং ব্যক্তি আক্রমণ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কৌশল। আমরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি সন্ত্রাসবাদ এক নেতিবাচক প্রক্রিয়া, কোনভাবেই এটা কাঙ্খিত ফললাভে সাহায্য করে না, এটা নির্দিষ্ট কোন বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি জনগণকে বিমুখ করে তুলতে পারে, কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জন ছাড়াই সন্ত্রাসবাদীদের জীবনহানি ঘটে। কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ কেবলমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য, যদি নাকি একজন প্রধান বিরোধীকে সরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সাহসী, আত্মবলিদানে প্রস্তুত এমন লোকদের কখনও একজন সামান্য হত্যাকারীকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। যার মৃত্যু বুমেরাং হয়ে ঐ কাজে নিযুক্ত সমস্ত বিপ্লবীদের এবং তার সঙ্গে অন্যদেরও ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

অন্তর্ঘাত দুরকমের হতে পারে : জাতীয় স্তরে বিশেষ কোন লক্ষ্যবস্তুর উপরে আঘাত, আর একটা যুদ্ধ অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে অন্তর্ঘাত। জাতীয় স্তরে অন্তর্ঘাত প্রধানত যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়। প্রত্যেক ধরনের অরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, টেলিগ্রাফে আর টেলিফোনের খুঁটিগুলো করাত দিয়ে কেটে ফেলা যায় যাতে রাত্রিবেলা মনে হয় সেগুলি ঠিক অবস্থাতেই আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা আকষ্মিক আঘাতে একটা ভূপাতিত, তার সঙ্গে অন্যান্য দুর্বল খুঁটিগুলোও হুড়মুড়িয়ে পড়ে গিয়ে এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

ডিনামাইট দিয়ে সেতু আক্রমণ করা যায়। যদি ডিনামাইট না থাকে, ইস্পাতের

সেতু খুব সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায় অক্সিএ্যাসিটিলিন ব্লোটর্চ-এর সাহায্যে। ঐ ধরনের সেতুর প্রধান দণ্ড এবং উপরের দণ্ডটিই যার থেকে ঝুলে থাকে, দুটি দণ্ডকেই কেটে ফেলা হয় টর্চের সাহায্যে ; সেতুটি একপ্রান্তে পড়ে যায়, ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ে ধ্বংস হয়। ডিনামাইট ছাড়াই সেতু উড়িয়ে দেবার এটা সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি। রেললাইন, রাস্তা, কালভার্ট ধ্বংস করা যায় ; কখনও কখনও ট্রেনও উড়িয়ে দেওয়া হয়, যদি অবশ্য গেরিলাদল খুব শক্তিশালী থাকে।

মাঝে মাঝে, প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান শিল্পগুলিকে ধ্বংস করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে, সমস্যাটা আগে ভাগে অনুধাবন করা উচিত ; যদি এর ফলশ্রুতিতে ব্যাপক কর্মহীনতা এবং অনাহারের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে এরকম পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকা উচিত। শাসন ব্যবস্থার মাথা এমন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত শিল্পদ্যোগগুলিকে ধ্বংস করা যেতে পারে। অবশ্যই ওখানের শ্রমিকদের ব্যাপারটার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে, না হলে গভীর সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হবে।

আমরা সব সময়েই জোর দিই যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতে। পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত শত্রু বাহিনীর শক্তির বড় উৎস হচ্ছে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই আমাদের সেই শক্তিটাকে গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। রেলসেতু, কালভার্ট, ইলেকট্রিক ও টেলিফোন লাইন, এমন কি কৃত্রিম জল-প্রণালী, সাধারণভাবে স্বাভাবিক এবং আধুনিক জীবনধারণের যা কিছু উপকরণ সবকিছুর উপরে আঘাত হানতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তর্ঘাত একই উপায়ে চালাতে হবে, কিন্তু আরও বেশি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আরও বেশি জোশ নিয়ে এবং অবশ্যই ক্রমাগত। এখানে এটা সম্ভব নয় টহলদারী গেরিলা বাহিনীর অমূল্য সাহায্যে, যারা এইসব অঞ্চলে প্রবেশ করে অসামরিক সংগঠনকে এই কাজে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত ব্যাপকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সমস্ত ফ্যাক্টরি, সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্র যেগুলি শত্রুসৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান দেয় সেগুলিকেও নষ্ট করে দেওয়া উচিত; কারণ এইভাবেই তারা জনগণের বাহিনীর প্রতি আক্রমণ শানায়। জোর দিতে হবে রসদ দখল করে যথাসম্ভব শত্রুর সরবরাহ লাইনটিকে বিচ্ছিন্ন করার দিকে। যদি দরকার হয় যারা ওদের পণ্য বেচে সেই সমস্ত বড় বড় জোতদারদের ভীতি প্রদর্শনও করতে হতে পারে। রাস্তা দিয়ে যেসব বাহন চলাফেরা করে সেগুলি পুড়িয়ে দিয়ে রাস্তায় অবরোধ তৈরি করা যাবে। প্রত্যেক অন্তর্ঘাতের সময় কাছাকাছি অবস্থিত শত্রুঘাটির উপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হবার পদ্ধতি খুব কাজে লাগে। খুব একটা বড় প্রতিরোধ গড়ে তোলার দরকার নেই, কিন্তু শত্রুদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যেখানে অন্তর্ঘাত হয়েছে সেই এলাকায় গেরিলারা লড়াইয়ের জন্য তৈরি। এর ফলে হয় তারা আরও অনেক সৈন্য নিয়ে আসবে, নয়তো একদমই আগে বাড়বে না।

এইভাবে ধীরে ধীরে গেরিলাবাহিনী দিয়ে ঘিরে রাখা সমস্ত শহরগুলো পঙ্গু হয়ে যাবে।

৬. যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্প

অনেক দিনের প্রচেষ্টার ফলে গেরিলাবাহিনী অধ্যুষিত অঞ্চলে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। অবশ্যই তা নির্ভর করে ভৌগোলিকভাবে অনুকূল অঞ্চলে গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণের উপর। যখন মুক্তাঞ্চল গড়ে ওঠে এবং শত্রু বাহিনী সমস্ত সরবরাহ ব্যবস্থার উপরে একটা কঠোর অবরোধ সৃষ্টি করে, তখন দরকার মত বিভিন্ন বিভাগ তৈরি করা হয়। দুটি মৌলিক শিল্প তৈরি করা হয়। দুটি মৌলিক শিল্প আছে যার একটি জুতো এবং চামড়ার অন্যান্য জিনিস তৈরি করা। খাড়াই, জঙ্গুলে, পাথুরে এবং কাঁটাপূর্ণপথে কখনই কোন বাহিনীর পক্ষে খালি পায়ে চলা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র স্থানীয়রা, তা-ও তাদের সবাই নয়, এ কাজে পারদর্শী। তাই অবশিষ্টদের জুতো থাকতেই হবে। এই শিল্পটির দুটি বিভাগ থাকা উচিত— একটি হাফসোল তৈরি করবে আর মেরামতের কাজ করবে, অন্যটি নতুন কাজ চালানোর মত জুতো বানাবে। ছোটখাট সব যন্ত্রপাতি মজুত করা দরকার এই কাজে। যেহেতু এটা একটা সহজ শিল্প, তাই অঞ্চলের অনেক লোককেই কাজে লাগানো যাবে। জুতোর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি ওয়ার্কশপে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় ক্যানভাস এবং চামড়ার জিনিসপত্র তৈরি হবে, যেমন গুলি রাখার বেল্ট এবং পিঠের ব্যাগ। যদিও এই জিনিসগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, তবুও এগুলি কিছুটা আরাম দিতে পারে গেরিলাদের, তাদের মধ্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতার মনোভাব গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে আত্মবিশ্বাস।

গেরিলাদলের ছোট আভ্যন্তরীণ সংগঠনের জন্য আর একটা অতি প্রয়োজনীয় শিল্প হচ্ছে অস্ত্রশালা। এরও বিভিন্ন কাজ আছে : খারাপ হয়ে যাওয়া অস্ত্র, রাইফেল ইত্যাদির মেরামত, কয়েক ধরনের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি যার পিছনে থাকে আবিষ্কারের মস্তিস্ক ; আর বিভিন্ন ধরনের মাইন তৈরি। যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয়, পাউডার তৈরি এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যদি মুক্তাঞ্চলে বিস্ফোরক এবং তা ফাটানোর যন্ত্রাংশে তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে তা দারুণ ব্যাপার হবে। এটা খুব দরকার, কারণ শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি পঙ্গু করে দেওয়া যায় মাইনের ঠিকমত ব্যবহার করে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল লৌহ এবং টিনজাত বস্তু উৎপন্ন করা। খচ্চরদের জুতো তৈরির জন্য কামারশালাকে কাজে লাগাতে হবে। টিন কারখানায় তৈরি করতে হবে প্লেট এবং খাবারের বাসনপত্র, যার খুব প্রয়োজন। টিন কারখানায় একটা ঢালাই কারখানা থাকলে ভাল। নরম ধাতু গলিয়ে গ্রেনেড তৈরি করা সম্ভব, যার সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের 'চার্জ' যুক্ত হলে বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। সাধারণ মেরামতি এবং বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজের জন্য একটা কারিগরী দল থাকবে, যাকে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে বলা হয় 'সার্ভিস ব্যাটারি'। গেরিলাদের সঙ্গে সমন্বয় করে এটি কাজ করবে, সমস্ত প্রয়োজনের দিকে নজর দেবে, কিন্তু কোন আমলাতান্ত্রিক কর্তা থাকবে না তাদের। একজন ব্যক্তির হাতে যোগাযোগের বা সংযোগের দায়িত্ব দিতে হবে। তারা যে শুধুমাত্র বহিরাঞ্চলে রেডিও মারফৎ প্রচার সংযোগের দায়িত্বে থাকবে তাই নয়,

টেলিফোন এবং বিভিন্ন রাস্তার দায়িত্বও নেবে। তারা দায়িত্ব পালনের জন্য সঙ্গে নেবে অসামরিক সংগঠনকে। মনে রাখা উচিত আমরা একটা যুদ্ধাবস্থায় আছি, সেখানে শত্রু যখন তখন আক্রমণ করতে পারে আর তাই দ্রুত সংযোগের উপর নির্ভর করে অনেক জীবন।

বাহিনীর আনন্দ বর্ধনের জন্য সিগারেট এবং সিগার ফ্যাক্টরী করার পরিকল্পনাটা ভালই। নির্দিষ্ট জায়গায় তামাক কিনে সেটাকে পাঠাতে হবে মুক্তাঞ্চলে এবং সেখানেই জিনিসটা তৈরি হবে। চামড়া তৈরির শিল্প গড়ে তোলা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো খুব সাধারণ শিল্প যা যে কোন জায়গায় গড়ে তোলা যায়। চর্মশিল্পের জন্য দরকার অল্প সিমেন্ট তৈরি করা; আবার অনেক পরিমাণে লবণও দরকার, কিন্তু জুতো তৈরির পক্ষে নিজেদের কাঁচা মাল থাকা খুব সুবিধাজনক। বিপ্লবী অঞ্চল বেশি পরিমাণে লবণ তৈরি করে তা মজুত করে রাখতে হবে। লবণযুক্ত জলকে বাষ্পীভবন করে লবণ তৈরি করা হয়। এর জন্য সমুদ্র হচ্ছে ভাল উৎস, অন্য কিছুও থাকতে পারে। একে বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই ব্যবহারের জন্য, যদিও প্রথমে এটার একটা বাজে স্বাদ থাকে।

মাংসও জমিয়ে রাখা দরকার। বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে এর দ্বারা অনেক যোদ্ধার জীবন বাঁচানো যায়। বড় বড় ব্যারেলে লবণ দিয়ে মাংস সংরক্ষণ করা যায়, পরে যে কোন জায়গায় ব্যবহার করার জন্য।

৭. প্রচার

যে কোন মাধ্যমের সাহায্যে, যতদূর সম্ভব বিপ্লবের আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সরঞ্জাম এবং একটি সংগঠন, সারা দেশে যার দুটি পরিপূরক শাখা থাকবে : একটি মুক্তাঞ্চলের বাইরে প্রচার যা চালাবে জাতীয় অসামরিক সংগঠন আর একটা ভিতরে যার উৎস হবে গেরিলাবাহিনীর ঘাঁটি। এই দুই ধরনের প্রচার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত, তার জন্য থাকবে একজনই পরিচালক।

মুক্তাঞ্চলের বাইরে অসামরিক সংগঠনগুলির পরিচালনায় যে জাতীয় প্রচার চালানো হবে তা করতে হবে সংবাদপত্র, বুলেটিন বা ঘোষণাপত্রের দ্বারা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রগুলি সাধারণত জাতীয় ঘটনাগুলি প্রকাশ করে এবং জনসাধারণকে গেরিলা বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে জানায়। এটাই তাদের মূল নীতি যে, ভবিষ্যতে সত্যই হবে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই সমস্ত প্রকাশনা ছাড়াও আরও কিছু থাকে, জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য যা বিশেষায়িত। গ্রামাঞ্চলে একটি প্রকাশনা কৃষক সমাজের কাছে বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলের বিপ্লবের মহৎ দিকগুলি সম্পর্কে বার্তা পাঠায়, যা তাদের আশাকে আরও উজ্জীবিত করে। শ্রমিকদের সংবাদপত্রও একইভাবে কাজ করে। কেবলমাত্র একটা পার্থক্য থাকে যে, গেরিলাযুদ্ধের মধ্যে তাদের শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব চূড়ান্ত ধাপের আগে থাকে না বলে, নিজেদের যোদ্ধাদের থেকে কোন বার্তা তারা দিতে পারে না।

বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যপ্রণালীর অন্যতম হচ্ছে সাধারণ ধর্মঘট, যা বিশেষ সুবিধাজনক সময়ে বিদ্রোহী বাহিনীকে সাহায্য করে এবং একতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা উচিত। অন্যান্য পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা চালাতে হবে, উদাহরণস্বরূপ সারা দ্বীপরাষ্ট্রে যোদ্ধারা ছাড়াও যারা অন্তর্ঘাত এবং অতর্কিত আক্রমণ চালাচ্ছে তাদের কাজকর্ম ব্যাখ্যা করতে হবে। সংগঠনের ভিতরে শত্রুসৈন্যদের উদ্দেশ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা যেতে পারে, তারা যেসব ব্যাপারে অজ্ঞ সেই বিষয়গুলি খোলসা করা যেতে পারে এর মাধ্যমে। নতুন নতুন বুলেটিন আর আন্দোলনের ঘোষণাপত্র খুব দরকারী প্রকাশনা।

গেরিলা অঞ্চলের ভিতরে যেসব প্রচার সংগঠিত করা হয় তা খুব কার্যকরী। এলাকার স্থানীয় জনগণের কাছে আদর্শ প্রচারকে প্রাধান্য দিতে হবে, বিদ্রোহের তত্ত্বগত তাৎপর্য তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। কৃষকদের জন্যেও প্রকাশনা থাকতে পারে, এছাড়াও গেরিলাবাহিনীর সাধারণ মুখপত্র, বুলেটিন এবং ঘোষণাপত্র এবং সর্বোপরি রেডিও।

সমস্ত সমস্যার আলোচনা হওয়া উচিত রেডিওতে—যেমন, বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায়, শত্রুবাহিনীর অবস্থান, এমনকি তাদের মধ্যে পরিচিত নামগুলিও বলে দেওয়া উচিত। মুক্তাঞ্চলের বাইরে যেমন সংবাদপত্র ব্যবহার করা হয়, জাতীয় স্তরে প্রচারে জন্য, তেমন সংবাদপত্র ভিতরেও প্রকাশ করা যায়। কিন্তু তাতে থাকবে সাম্প্রতিকতম বিশেষ সংবাদ, পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে ঘটনা এবং যুদ্ধের বিবরণ। মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংবাদই কেবল প্রকাশিত হবে।

সবচেয়ে কার্যকরী প্রচার হল রেডিও-র মাধ্যমে বলা বিবরণ যা খুব সহজেই দেশের সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের যুক্তি এবং মানসিকতার কাছে তার আবেদন অনস্বীকার্য। একটা সময়ে যখন কোন অঞ্চলের অথবা দেশের লোকে যুদ্ধের আঁচে কমবেশি কাঁপতে থাকে, তখন উদ্দীপক, জ্বলন্ত শব্দসমূহ আগুনের তাপটাকে বাড়িয়ে দেয় এবং ভবিষ্যতের যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করে ; ব্যাখ্যা করে, শিক্ষা দেয় এবং ভবিষ্যতের বন্ধু এবং শত্রুদের ভবিষ্যত অবস্থান স্পষ্ট করে। রেডিওর প্রচারের মৌলিক নীতি হবে জনপ্রিয় প্রচার, অবশ্যই যা সত্য। কৌশলের সাহায্যে বিরাট মিথ্যা প্রচারের চেয়ে অকিঞ্চিৎকর সত্যও শ্রেয়। রেডিও প্রচার করবে বিবরণী, বিশেষ করে যুদ্ধের, সবরকমের সংঘর্ষের, অত্যাচারী শত্রুদের দ্বারা জনগণকে হত্যার কাহিনী ; মতাদর্শগত এবং ব্যবহারিক শিক্ষাও দেবে অসামরিক জনগণকে আর তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিপ্লবী নেতৃত্বের ভাষণ।

প্রধান সংবাদপত্রের এমন একটা নাম থাকা উচিত, যার মাধ্যমে একটা মহান এবং একতাবদ্ধ প্রতিমূর্তি অনুভব করা যায়, তাই একজন জাতীয় বীর অথবা সেইধরনের কিছুর নামে নামকরণ করা উচিত। চিন্তাশীল প্রবন্ধের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা উচিত আন্দোলনের অগ্রগতি এবং গভীর জাতীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটা চেতনা সৃষ্টি করা, এ ছাড়াও থাকবে পাঠকের কাছে প্রাণবন্ত উৎসাহের সৃষ্টি করতে পারে এরকম লেখা।

৮. বুদ্ধিমত্তা

"নিজেকে জানো আর জানো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে, একটাও দুর্বিপাক ছাড়া তুমি সক্ষম হবে শত যুদ্ধে লড়াই করতে।" এই চিনা প্রবাদ বাক্যটি গেরিলাযুদ্ধের ক্ষেত্রে বাইবেলের স্তোত্রের মত মূল্যবান। সঠিক বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আর কোন কিছুই যোদ্ধাবাহিনীকে সাহায্য করতে পারে না। স্থানীয় অধিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বন্ধু-বাহিনীকে, মিত্রদের খবর দেবে কোথায় কি ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সেগুলিকে তথ্যনিষ্ঠ হতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি গেরিলা অঞ্চলের ভিতরে এবং বাইরে সংবাদ এবং জিনিসপত্র বহনের জন্য একটা ডাক ব্যবস্থা থাকা উচিত। শত্রুর অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রাখার জন্য একটা গুপ্তচর সংস্থা রাখা উচিত ; যাতে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই শত্রু অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করতে পারে। তারা শত্রুসৈন্যদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ রাখবে, এবং ধীরে ধীরে তাদের ভিতরের খবর বার করবার চেষ্টা চালাবে। এমনভাবে ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করতে হবে যে শত্রু সীমানা পেরিয়ে গেরিলা শিবিরে ফেরাটা নির্বিঘ্নেই হবে।

দুঁদে এজেন্টরা যদি কাজটা ঠিকঠাক করতে পারে, বিদ্রোহী বাহিনী একটু শান্তিতে নিদ্রা যায়।

গুপ্তচর বৃত্তিটা চালাতে হবে নিজেদের এলাকা আর শত্রুর অগ্রগামী অংশের মধ্যে যে নো-ম্যানস ল্যাণ্ড থাকে সেই অঞ্চলে। কিন্তু গেরিলবাহিনীর গভীরতাটা আরও বাড়াতে হবে, যাতে শত্রুবাহিনীর পিছনদিকে আরও বড় কোন বাহিনীর যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এ বিষয়ে আগাম অনুমান করতে পারে। যেখানে গেরিলা বাহিনীর প্রভাব বেশি, সেখানে সব স্থানীয় মানুষই গুপ্তচর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিশেষভাবে এই কাজের জন্য লোক নির্বাচন করা জরুরী। কৃষকেরা সামরিক ভাষায় সঙ্গে পরিচিত নয়, তাই তাদের মধ্যে অতিশয়োক্তির একটা ঝোঁক থাকে, সেটা ঠিকমত বিচার করতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতাকে সংগঠিত করে গুপ্তচরবৃত্তির অস্ত্রটিকে শুধু সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে না রেখে, আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, শত্রুর মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে। শত্রুসৈন্যের দলে আছে এমন ভান করে তারা ভীতি এবং অস্থিরতার বীজ পুঁতে নানারকম নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক খবর ছড়াবে। মূল কৌশল হিসাবে গতিময়তাকে উন্নত করতে হবে। ঠিক কোন জায়গায় শত্রুবাহিনী আক্রমণ করবে, ঠিকমত তা জানা থাকলে সহজেই তাদের এড়ানো যায় অথবা সময়ের সদ্ব্যবহার করে, যেখানে তারা আশা করে নি তেমন জায়গায় চকিত আক্রমণ করা যেতে পারে।

৯. প্রশিক্ষণ এবং আদর্শ প্রচার

গেরিলাযোদ্ধা আবশ্যিকভাবে গেরিলাদলে সারা জীবন ধরে তার প্রশিক্ষণ নেবে এবং তাদের মধ্যে কেউ নেতা হতে পারে না যতক্ষণ না সে দৈনন্দিন সামরিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তার কঠিন ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক শিক্ষালাভ করছে। কিন্তু সহযোগী যোদ্ধাকে

শিখতে হয় অস্ত্রশিক্ষা, অসামরিক জনগোষ্ঠীকে মতাদর্শে দীক্ষিত করা এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহার, লড়াইয়ের পদ্ধতি ইত্যাদি ; কিন্তু মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয় কেবলমাত্র প্রথাগত শিক্ষায়। এটা শুরু হয় যখন মুক্তাঞ্চলের আয়তনটা বিরাট হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক লোকের দরকার হয়। তখন নিয়োগের জন্য স্কুলও খুলতে হয়।

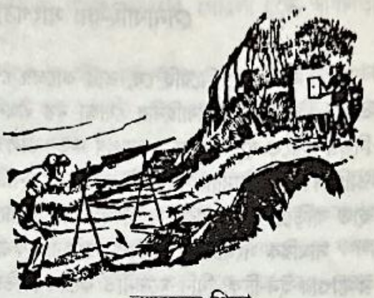
এই স্কুলগুলির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে ; যারা এখনও পর্যন্ত জীবনের সেই ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করেনি, এমন নতুন যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেবে এই স্কুলগুলি—তা হল গেরিলা যোদ্ধার জীবন। শুরু থেকেই তাদের কষ্ট সহ্য করতে শেখাতে হবে, যাতে তারা খাঁটি হয়ে গড়ে ওঠে। অনেক কঠিন পরীক্ষায় সফল হয়ে তাদের সেই সর্বহারা বাহিনীর রাজত্বে সামিল করা যেতে পারে, যারা চলার পথে পিছনে কোন চিহ্ন ফেলে রাখে না। দুধরনের শারীরিক ব্যায়াম করানো হয় তাদের কম্যাণ্ডো প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে— জিমন্যাসটিকস্, যা দরকার আক্রমণ ও পশ্চাদপসরনের ক্ষিপ্রতার জন্য ; এবং কঠিন ও শরীর নিঃশেষিত করে ফেলা পদযাত্রা, যা নবনিযুক্ত সৈনিককে এই ধরনের জীবনের অস্তিত্বে শক্তপোক্ত করে তুলবে। সর্বোপরি তাদের থাকতে হবে খোলা আকাশের তলায়। গেরিলা বাহিনীর অন্য সকলের মত আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে। নিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় সরবরাহের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কর্মী থাকবে এইজন্য সেখানে থাকবে গবাদি পশুর গোয়াল, শস্য রাখার জায়গা, বাগান, দুগ্ধকেন্দ্র এবং আরও যা যা দরকার সবকিছু—যাতে গেরিলা বাহিনীর কাছে তার টাকা যোগান দিতে গিয়ে এটা একটা বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রদের এই সরবরাহের কাজে পর্যায়ক্রমে লাগানো যেতে পারে, হয় একটা কোন শাস্তি হিসাবে অথবা কেবলমাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে।

কোথায় স্কুলটি অবস্থিত তার এলাকার উপরে নির্ভর করে চাঁদমারি পরীক্ষা করা যাবে কিনা। এর জন্য, আমরা বিশ্বাস করি, স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করতে হবে আর যাদের অত্যন্ত খারাপ রেকর্ড আছে আর যারা যুদ্ধবিদ্যা শেখার ব্যাপারে অনাগ্রহী, তাদের বাদবাকি অন্যান্য কাজকর্ম ভাগ করে দেওয়া উচিত।

স্কুলটির একটি ছোটখাট ডাক্তারী সহায়তা কেন্দ্র থাকা দরকার, যেখানে একজন ডাক্তার বা নার্স থাকবে, অবশ্যই পরিস্থিতি বিচার করে, এতে নবনিযুক্তদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

গুলিচালনা শিক্ষা হচ্ছে মৌলিক প্রশিক্ষণ। গেরিলা যোদ্ধাকে এই ব্যাপারে ঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করতেই হবে, যাতে মহিলা বা পুরুষ যাই হোক না কেন, ন্যূনতম পরিমাণ গোলাগুলি খরচ করতে শেখে। শিক্ষা শুরু হবে ড্রাই-শুটিং দিয়ে। ছবিতে যেমন দেখানো আছে, তেমনভাবে রাইফেলটাকে একটা কাঠের কাঠামোর উপর রেখে দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে। না নড়িয়ে অথবা গুলি না ছুঁড়ে শিক্ষার্থী কেন্দ্রে ছিদ্র করা একটা চলমান বোর্ডের দিকে তাক করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মনে করবে যে কেন্দ্রটি তার দৃষ্টির মধ্যে আছে। ঐ বোর্ডের পিছনে আর একটি বোর্ড থাকবে যা নাড়াচাড়া করবে না। যদি অনেকবার চেষ্টা করে একটা বিন্দুতে গুলি লাগে, তাহলে বলতে হবে চমৎকার। সম্ভব

হলে, ২২ ক্যালিবার রাইফেলে অভ্যাস করানো যায়, এটা খুব কার্যকরী। যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে গুলি থাকে অথবা সৈন্যদের তৈরি করে তোলার জন্য জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখন তাদের বুলেট ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়।



লক্ষ্যভেদ শিক্ষা

নিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে সবচেয়ে জরুরী শিক্ষাদানের একটি হল যেকোন জায়গায় বিমান আক্রমণ হলে, কি করণীয় সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া। স্কুলগুলি আকাশ থেকে ভালভাবেই লক্ষ্য করা হয় এবং দিনে একবার বা দুবার আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্ত প্রতিনিয়ত আক্রমণের সময়ে কিভাবে নতুন গেরিলারা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়, তা থেকেই বোঝা যায় তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোদ্ধা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কতটুকু।

এই সমস্ত স্কুলে যে কাজটা কোনসময়েই অবহেলা করা উচিত নয়, সেটা হল মতাদর্শগত শিক্ষা। এটা খুব দরকার এইজন্য যে কেন তারা এসেছে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণাটা লোকেদের থাকে না, কেবল কিছু ভাসাভাসা ধারণা থাকে মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে, আদর্শগত ভিত্তি তেমন থাকে না। সেইজন্য যতটা সম্ভব সময় দিয়ে চূড়ান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে মতাদর্শ শিক্ষা দেওয়াটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর মধ্যে থাকবে দেশের ইতিহাস, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনের অর্থনৈতিক কারণগুলি ব্যাখ্যা; এছাড়াও জাতীয় বীরদের কার্যাবলীর বিশ্লেষণ, সমাজের অসাম্য, অন্যায় দূর করতে তাঁরা কি কি কাজ করেছেন এবং শেষে জাতীয় পরিস্থিতি অথবা এলাকার পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। বিদ্রোহী বাহিনীর সকলেরই প্রাথমিক শিক্ষাটা থাকা জরুরী, জনশিক্ষার একটা খসড়া হিসাবে যা পরে কাজে লাগবে।

একটা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকাটা জরুরী, যেখানে পাঠ্য বিষয় ঠিক করা হবে, শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বইয়ের অবদান বিচার-বিবেচনা করা হবে।

পড়ার ব্যাপারে সবসময় উৎসাহ যোগাতে হবে ; যে সমস্ত বই তাদের পক্ষে উপযোগী, সে সমস্ত বই সরবরাহ করতে হবে, যার দ্বারা নবনিযুক্তদের পড়াশোনার জগৎ এবং জাতীয় সমস্যা বোঝার ব্যাপারে ক্ষমতা জন্মায়। আরও নতুনকে জানার আকাঙ্ক্ষাটা বাড়বে, পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতা বাড়বে। আস্তে আস্তে তারা দেখবে দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে যে সমস্ত সৈনিকরা অন্যদের থেকে শিক্ষায় উন্নতমানের অধিকারী, তারা বাহিনীর অন্যান্যদের চেয়ে বেশি সুযোগ পাচ্ছে। কারণ তাদের সমস্যা বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং উন্নত নিয়মশৃঙ্খলার ধারনা—এই ব্যাপারগুলোও স্কুলকেই শেখাতে হবে।

উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যান্ত্রিক শৃঙ্খলা নয়, বরং তা অভ্যন্তরীণ বাস্তবসম্মত বোঝাপড়া থেকে উদ্ভূত হয়—যা যুদ্ধকালীন সময়ে দুর্দমনীয় ফলাফল উপহার দেয়।

১০. বিপ্লবী আন্দোলনের সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো

এটা আমরা দেখিয়েছি যে, তার কাজের ক্ষেত্র যেখানেই বিস্তৃত হোক না কেন, একটি বিপ্লবী গেরিলাবাহিনীর যোদ্ধা নয় এমন অর্থাৎ অসামরিক সংগঠনের উপর নির্ভর করতে হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি সহযোগী কাজকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের তাগিদে। পরে আমরা দেখব এই সমগ্র সংগঠনটি সেনাবাহিনীকে তার চূড়ান্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, কারণ সশস্ত্র সংগ্রাম জয়লাভের প্রধান রূপকার।

সামরিক সংগঠনের নেতৃত্বে থাকেন একজন কম্যাণ্ডার, কিউবার ক্ষেত্রে একজন কম্যাণ্ডার ইন-চিফ, যিনি মনোনীত করেন বিভিন্ন এলাকা অথবা অঞ্চলের নেতাদের। এইসব সামরিক নেতারা তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের কার্যক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করেন, তারা আবার নিযুক্ত করেন কলাম কম্যাণ্ডারদের এবং অন্যান্য অধস্তন অফিসারদের। কলাম কম্যাণ্ডারদের অধীনে থাকবেন ক্যাপটেন এবং লেফটেন্যান্টরা, যেটা আমাদের গেরিলা সংগঠনে সবচেয়ে নিচু পদ। অন্যকথায় বললে সাধারণ সৈনিকদের ঠিক উপরেই থাকেন লেফটেন্যান্টরা। এটাকে ঠিক আদর্শ না বলে বলা উচিত একটি ক্ষেত্রের বিবরণ, অর্থাৎ একটা দেশে যেখানে একটি সরকারী সৈন্যবাহিনী দৃঢ় সংগঠিত এবং যথেষ্ট সশস্ত্র, সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য কেমন করে একটি সংগঠন কাজ করে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের অভিজ্ঞতা আদর্শ নয়। এটা কেবলমাত্র দেখায়, ঘটনার পরতে পরতে কেমন করে একটা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। অবশ্যই পদের বিরাট কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু এটা প্রয়োজনীয় যে কাউকেই পদ দেওয়া উচিত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন বাহিনীকে কার্যকরী নেতৃত্ব দিতে পারে। কারও পদোন্নতি করাও উচিত নয় যে আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের কঠিন, কঠোর পথ মাড়িয়ে এসেছে, তা না হলে নৈতিকতা এবং ন্যায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে।

এই বর্ণনাটা একটি যথেষ্ট উন্নত সেনাবাহিনীর, ইতিমধ্যেই ভয়ংকর যুদ্ধে যারা জয়ী হয়েছে। গেরিলা দলের প্রথম স্তরে, নেতৃত্বে যিনি থাকবেন তিনি যে কোন পদ নিতে পারেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তিনি কেবলমাত্র একটা ছোট দলকেই নেতৃত্ব দেন। সামরিক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। গেরিলাবাহিনীর কাজকর্মের অন্যতম ভিত্তিই হল শৃঙ্খলা (বার-বার জোর দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারকে)। যেটা আমরা বলে থাকি, এই শৃঙ্খলা উৎসারিত হয় এক যুক্তিবাদী মননশীলতা থেকে, যার ফলে কোন ব্যক্তি তার অভ্যন্তরে একটা শৃঙ্খলার তাগিদ অনুভব করে। শৃঙ্খলা যখন লঙ্ঘিত হয়, তখন পদমর্যাদা নির্বিচারে শাস্তি দেওয়া উচিত এবং সে শাস্তি হওয়া উচিত যথাসম্ভব কঠোর।

এটা খুব জরুরী, কেননা একজন গেরিলা যোদ্ধা যেভাবে যন্ত্রণাবোধ করেন তা নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর থেকে পৃথক। শাস্তি হিসাবে ১০ দিন জেলে থাকাটা একজন গেরিলা যোদ্ধার কাছে একটা বিরাট বিশ্রামের সামিল; কিছুই করার নেই, ১০ দিন শুধু

খাওয়া দাওয়া, কোন পদযাত্রা নেই, কাজ নেই, পাহারা দেওয়ার কাজ নেই, কেবল ইচ্ছামত ঘুম, বিশ্রাম, বই পড়া ইত্যাদি। এর থেকে পরিস্কার, গেরিলা যুদ্ধে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়াটা সুপারিশ করা যায় না।

যেখানে একজন যোদ্ধার নৈতিক মান খুব উঁচু এবং আত্মসম্মান জ্ঞান প্রবল তখন সশস্ত্র থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়াটাই প্রকৃত শাস্তি এবং এতে তার প্রতিক্রিয়া হয় ইতিবাচক। এইসব ক্ষেত্রে এটাই কার্যকরী শাস্তি।

একটা দুঃখজনক ঘটনার উদাহরণ দিই। লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্বে, লাস ভিইয়াস প্রদেশের একটি শহরের যুদ্ধে, আমরা দেখি, অন্যেরা যখন শহরের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণের কাজে ব্যপৃত, একজন চেয়ারে বসে তখন ঘুমোচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে, তার ঘুমিয়ে পড়ার কারণ, আচমকা গুলি ছোঁড়ার অপরাধে তার অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে বলা হল শাস্তির প্রতিক্রিয়া জানানোর উপায় এটা নয়, তাকে অস্ত্র ফিরে পেতে হলে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে হবে।

কয়েকদিন পরে, যখন সানতাক্লারা শহরে চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হয়েছে, আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রটি ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম। এক মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিক তার হাতটি বাড়িয়ে দিল, মনে পড়ল যে ঘটনাটা আমি উপরে বর্ণনা করলাম সেটি। সে বলল যে, তার অস্ত্রটি আবার ফিরে পেয়ে সেটিকে বহন করার অধিকার পেয়েছিল, একটু পরে সে মৃত্যুর কোলে চলে পড়েছিল।*

ক্রমাগত সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের বাহিনী এই ধরনের বিপ্লবী নৈতিকতার মান অর্জন করেছিল। প্রাথমিক স্তরে এটা থাকে না, কারণ তখন পর্যন্ত অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত থাকে এবং বিপ্লবী প্রভাব মাঝে মাঝেই ব্যাহত হয়, এটা অর্জন করা যায় ক্রমাগত কাজ এবং অনুসরণযোগ্য উদাহরণের মধ্যে দিয়ে।

ক্রমাগত রাত্রি প্রহরা এবং বাধ্যতামূলক পদযাত্রা শাস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের পদযাত্রা খুব একটা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ তা একজন ব্যক্তির ক্ষমতা নিঃশেষ করে দেয় কেবলমাত্র শাস্তি প্রদানের জন্য। আবার তাদের পিছনে পাহারা লাগাতে হয়। যারা নিজেরাও শাস্তিপ্রাপ্ত লোকটিকে পাহারা দিতে গিয়ে অনর্থক অসুবিধায় পড়ে, তাদের বিপ্লবী মানসিকতাও সীমাবদ্ধ।

আমার নেতৃত্বে থাকা বাহিনীর মধ্যে ছোটখাট অপরাধের জন্য আমি আরোপ করেছিলাম অপরাধীর গ্রেপ্তার, তার সঙ্গে মিষ্টি আর সিগারেট পাবার অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং গুরুতর অপরাধের কারণে সব কিছুর অধিকার কেড়ে নেওয়া। খুব ভালো ফল পাওয়া যেত এতে, যদিও শাস্তিটা ছিল ভীতিপ্রদ। তবে এই ধরণের শাস্তি একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই প্রয়োগ করা উচিত।

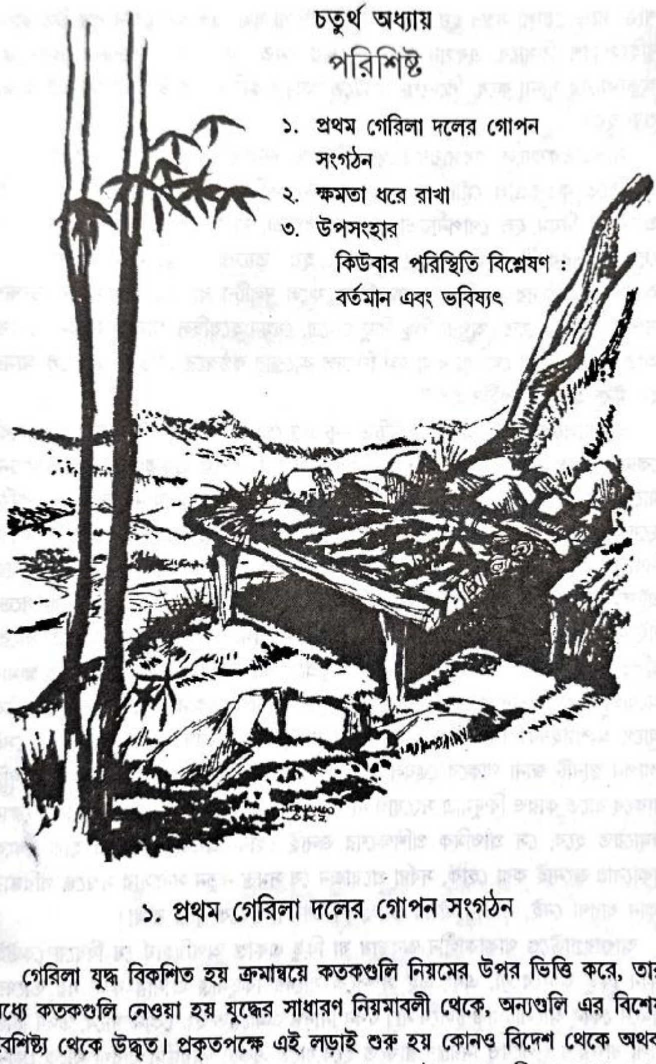
---

* এই ঘটনাটি আবার বলা হয়েছিল 'স্মৃতিকথায় কিউবা বিপ্লব'-এ 'চূড়ান্ত আক্রমণ ও সানতাক্লারা যুদ্ধ' পরিচ্ছেদে।


নেতা ও কমাণ্ডার
একান্ত আলোচনা

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট



১. প্রথম গেরিলা দলের গোপন সংগঠন

গেরিলা যুদ্ধ বিকশিত হয় ক্রমান্বয়ে কতকগুলি নিয়মের উপর ভিত্তি করে, তার মধ্যে কতকগুলি নেওয়া হয় যুদ্ধের সাধারণ নিয়মাবলী থেকে, অন্যগুলি এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ধৃত। প্রকৃতপক্ষে এই লড়াই শুরু হয় কোনও বিদেশ থেকে অথবা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। এটা অবশ্যম্ভাবী যে গোপন কাজ শুরু করা উচিত কেবলমাত্র একটা ছোট্ট দল নিয়ে, তারা জনগণের সংগ্রাম ছাড়াও এই বিশেষ কাজটি করবে। যদি কোন ধরণের নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্তভাবে গেরিলা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাহলে এই গেরিলা সংগঠনের পক্ষে ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী

শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। তা সত্ত্বেও গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় কোন বহুচর্চিত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে; একসন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা জনগনের মুক্তির তাগিদে এক অভ্যুত্থানের সূচনা করে, বিদেশের মাটিতে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এই কাজটা শুরু হয়।

সাম্প্রতিককালে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনগুলি অপরিণত প্রস্তুতিতে কতকগুলি মৌলিক দুর্বলতার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনও বিদ্রোহের প্রধানতম নিয়ম হল গোপনীয়তা এবং সাবধানতা, যা সাধারণত পালন করা হয়নি। দেশের সরকারী ক্ষমতা আগেভাগেই হয় তাদের গুপ্তচরদের দ্বারা অথবা আন্দোলনকারীদের অনভিজ্ঞ অসতর্কতার ফলে দলটির বা একাধিক দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনে যেত ; অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন হয়েছিল আমাদের বেলায়, যখন আক্রমণের কথাটা ঘোষণা করা হল ফিদেল কাস্ত্রোর কণ্ঠস্বরে : "১৯৫৬ সালে আমরা হয় মুক্ত হবো বা শহীদ হব।"

আন্দোলনের মূল কথা হওয়া উচিত—চূড়ান্ত গোপনীয়তা, শত্রুর কাছে কোনভাবেই কোন তথ্য প্রকাশ না করা। দ্বিতীয়ত এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-সদস্য নির্বাচন। মাঝে মাঝে নির্বাচনটা সহজেই করা যায়। কিন্তু কোন কোন সময়ে নির্বাচনটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কেননা যাদের পাওয়া যায় তাদের ওপরই বিশ্বাস রাখতে হয়। অনেক দিন নির্বাসনে থাকা অথবা স্বেচ্ছায় যে সমস্ত ব্যক্তিরা সদস্যযোদ্ধা হতে ইচ্ছুক থাকে তারা এটুকুই বোঝে যে, দেশকে মুক্ত করার কাজে যুদ্ধ করাটা তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই সমস্ত ব্যক্তির সম্পর্কে ভাল করে জানার সুযোগ সবসময় না-ও থাকতে পারে। যদিও শত্রুর দলের লোকের বিপ্লবী দলে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকে, এটা কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ যদি তারা সংবাদ পাচার করতে পারে। কোন লড়াই শুরু হবার ঠিক আগে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের কোন গোপন স্থানে জমায়েত করতে হবে এবং সেই গোপন স্থানটি জানা থাকবে কেবল এক বা দু'জনের। বাহিনীর নেতাদের কঠোর দৃষ্টি থাকবে যাতে কারও বিন্দুমাত্র সংযোগ না থাকে বহির্বিশ্বের সাথে। যখনই এরকম কোন জমায়েত হবে, সে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্যই হোক অথবা পুলিশের হাত থেকে লুকানোর জন্যেই করা হোক, সর্বদা প্রয়োজন যে সমস্ত নতুন সদস্যের সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই, তাদের ঐসব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে দূরে রাখা।

আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকাকালীন অবস্থায় যা কিছু একান্ত অপরিহার্য যে বিষয়ে কেউই কোন কিছু জানবে না, এবং এই সম্পর্কে যাদের কিছুমাত্র জানার কথা নয় তাদের সামনে কোন আলোচনাও চলবে না। যখন নির্দিষ্ট জমায়েত হয় কোন স্থানে, তখন চিঠি আসা-যাওয়ার ওপরেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে,যাতে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকে কোন্ ব্যক্তি কাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কাউকেই একা একা বাস করা অথবা কোথাও যেতে অনুমতি দেওয়া হবে না। মুক্তিবাহিনীর ভবিষ্যৎ সদস্যদের যে কোন ধরনের সংযোগ সে যার সঙ্গেই হোক, বন্ধ করতে হবে। লড়াইয়ের সময়ে মহিলাদের ভূমিকা যতই ইতিবাচক হোক না কেন, এটা মনে রাখতেই হবে যে তারা ধ্বংসাত্মক ভূমিকা

পালন করতে পারে। তাদের অভ্যস্ত জীবনধারা থেকে অনেক দূরে থাকা যুবকদের সামনে প্রলোভনের ফাঁদ পাততে পারে মহিলারা যা অত্যন্ত পরিচিত এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। যেহেতু স্বৈরতন্ত্রী শাসককুল এই দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা চেষ্টা করে গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ করানোর। মাঝে মাঝে উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গে এই সমস্ত মহিলাদের সম্পর্ক স্পষ্ট, এমনকি অত্যন্ত বাজে;কখনও কখনও বিন্দুমাত্র সম্পর্ক প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেহেতু মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রতিহত করতে হবে।

যুদ্ধ প্রস্তুতিরত গুপ্ত পরিস্থিতিতে থাকা একজন বিপ্লবী হল ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত, এটা তাদের গুণাবলীর অন্যতম পরীক্ষা, যা পরে তাদের কর্তৃত্বের ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হবে: শৃঙ্খলা। যদি কোন ব্যক্তি বারংবার তার উর্দ্ধতনদের আদেশ অমান্য করে, মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, কাম্য নয় এমন বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, তৎক্ষণাৎ তাকে আলাদা করে দিতে হবে, কেবলমাত্র অন্যদের চরম বিপদ হতে পারে এই আশঙ্কাতেই নয়, মূল ব্যাপার, বিপ্লবী শৃঙ্খলা ভাঙার দায়ে।

বন্ধুভাবাপন্নই হোক আর ঔদাসীন্যের ফলেই হোক, তার মাটিকে যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করতে দিতে নিঃশর্ত সাহায্য কোন সরকারের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সবসময়েই মনে রাখতে হবে যে, আন্দোলনটা হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ বৈরি বা প্রতিকূল পরিবেশে। সাধারণ ওই নিয়মের খুব কমই ব্যতিক্রম ঘটে।

কতজন লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি না। এত বিভিন্ন অবস্থার উপর এটা নির্ভরশীল যে ঠিকমত নির্দিষ্ট করে দেওয়া অসম্ভব। কেবল এটা বলা যায় যে, একটি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে গেলে ন্যূনতম কতজন সদস্য দরকার। আমার মতে, অবশ্যম্ভাবী কিছু সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে খুব কঠোর এবং কঠিন নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করলেও আমেরিকার যে কোন দেশে একটি অনুকূল অঞ্চলে যেখানে জমির জন্য আকুতি আছে, দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা অন্যায়, অসাম্য ইত্যাদি আছে, সেখানে সশস্ত্রযুদ্ধ শুরু করতে গেলে ৩০ থেকে ৪০ জন গেরিলার একটা কেন্দ্রীয় বাহিনী আবশ্যক।

আগেই বলা হয়েছে, শত্রুরা যেমন অস্ত্র ব্যবহার করে তেমন অস্ত্রই দরকার। নীতিগতভাবে প্রত্যেক সরকারই গেরিলা যুদ্ধের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন, এটা ধরে নিয়ে গেরিলাদের এক একটি ইউনিটে ৫০ থেকে ১০০ জন থাকা উচিত। অন্যভাবে বলতে গেলে একটা যুদ্ধ শুরু করতে পারে ৫০০ জন, কিন্তু ঐ ৫০০ জনকেই একজায়গায় জমায়েত করা চলবে না, প্রথমত, এতজন জড়ো হলে সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে এবং একটা বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতি আক্রমণ পুরো দলটাকেই শেষ করে দিতে পারে দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন জায়গায় একই সময়ে আক্রমণ করা শত্রুদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সভার জন্য কেন্দ্রীয় সদরদপ্তরটি কমবেশি চেনা থাকবে প্রত্যেকের এবং আত্মগোপনকারী সদস্যরা সব ধরণের সভার জন্য সেখানে যাবে, কিন্তু নেতারা উপস্থিত হবে কখনও কখনও এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি রাখা চলবে না সেখানে। নেতারা থাকার

জন্য যথাসম্ভব বিভিন্ন বাড়ি ব্যবহার করবে, যার থেকে নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে ন্যূনতম। অস্ত্রভাণ্ডার থাকবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে, এইসব অবস্থানগুলো চূড়ান্ত গোপনীয় থাকবে, জানা থাকবে কেবল এক বা দুজনের কাছে।

যুদ্ধ যখন শুরু হতে যাচ্ছে তখনই অস্ত্রগুলো তুলে দেওয়া হবে যোদ্ধাদের হাতে। এটা করা হয় প্রশিক্ষণরত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ বা তাদের বন্দী হবার আশঙ্কা এড়ানোর জন্য। এর জন্য অস্ত্র খোওয়া গেলে জনগণের বাহিনীর কাছে সেটা হবে মারাত্মক আঘাত।

যখন কোন ভয়ঙ্কর কঠিন লড়াই লড়তে হবে, তার প্রাক্কালে সেটা সবচেয়ে দরকারী তা হল বাহিনীর প্রত্যেকের থাকবে কঠোর শৃঙ্খলা, উচ্চ নীতিবোধ এবং যে কাজটি করতে হবে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা; কোনও বাহাদুরি, মোহ অথবা সহজ বিজয়ের মিথ্যে আশা থাকবে না। লড়াইটা হতে পারে তিক্ত এবং দীর্ঘ, পরাজয় হতে পারে, ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে; কেবলমাত্র উচ্চ নীতিবোধ, শৃঙ্খলা, চূড়ান্ত বিজয়ের বিশ্বাস এবং অসাধারণ নেতৃত্ব এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এটাই কিউবায় আমাদের অভিজ্ঞতা। যদিও একটা সময়ে মাত্র ১২ জন গড়ে তুলেছিল ভবিষ্যৎ বাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু, এই সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা এবং যে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল তার নাম ফিদেল কাস্ত্রো।

আদর্শগত এবং নৈতিক প্রস্তুতির পাশাপাশি পরিপূর্ণ শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাদের কাজকর্মের জন্য গেরিলারা পর্বতসঙ্কুল অথবা রুক্ষ কোনও অঞ্চলকে নির্বাচন করবে। যে কোন পরিস্থিতিতে তারা গেরিলা বাহিনীর মূল কৌশল পদযাত্রায় সামিল হবে এবং ধীরগতি বা ক্লান্ত লোককে নেওয়া হবে না। সেইজন্য শরীর অবশ করা দিনে রাতে, দিনের পর দিন, শ্রান্তি-ক্লান্তি গ্রাস করলেও হাঁটার অভ্যাস করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে ভবিষ্যত গেরিলাদের। প্রতিরোধ এবং গতি—এই দুটি মূলমন্ত্র গেরিলা বাহিনীর মধ্যমণিদের। এছাড়াও অনেক তত্ত্বগত নীতিও শিখতে হবে। যেমন—দিকনির্ণয়, পড়াশোনা এবং অন্তর্ঘাতের বিভিন্ন কলাকৌশল। সম্ভব হলে, প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত মিলিটারি রাইফেলে, বিশেষ করে দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে ক্রমান্বয়ে গুলিচালনা এবং গুলিগোলার কম খরচ করার জন্য একগুচ্ছ উপদেশ।

গেরিলা যোদ্ধার কাছে গুলিখোলার কম খরচ এবং শেষ গুলি পর্যন্ত ঠিকমত কাজে লাগানো একধরনের ধর্মীয় অনুশাসনের মত। যদি উপরে বর্ণিত সব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, গেরিলা বাহিনী তাদের শেষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

২. ক্ষমতা ধরে রাখা

স্বভাবতই পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনী যতক্ষণ না পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়, চূড়ান্ত জয়লাভ কখনই সম্ভব হয় না। এছাড়াও পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করত

যেসব সংস্থা তাদেরও গুঁড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল গেরিলা, তাই যুদ্ধের সময়ে প্রতিরক্ষা অথবা নতুন শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিরক্ষার সমস্যা নিয়ে বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রথম জিনিসটা যেটার মুখোমুখি হই আমরা, সেটা বিশ্বজনমত।

"চিন্তাশীল সংবাদপত্র", "সত্যনিষ্ঠ" সংবাদ সংস্থাগুলির মালিক বেশিরভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশগুলির একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, তারা মুক্ত দেশটির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানায়, সে আক্রমণটা তথাকথিত জন-সংস্কারভিত্তিক আইনের মত একইরকম আক্রমণাত্মক, সুসংবদ্ধ। সেইজন্য পূর্বতন সৈন্যবাহিনীর কোন কিছু অবশিষ্ট রাখা যাবে না। সামরিকতন্ত্র, অন্ধ আনুগত্য, সামরিক কর্তব্য সম্বন্ধে পুরানো ধারণা, শৃঙ্খলা এবং নীতিবোধ একদিনে নির্মূল করা যায় না। বিজয়ীদের অর্থাৎ যারা দারুণ যোদ্ধা, অত্যন্ত ভদ্র এবং দয়ালু, কিন্তু একই সময়ে যাদের প্রথাগত শিক্ষার অভাব আছে, আর পরাজিতরা যারা বিশেষ ধরনের সামরিক বিদ্যার জ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, দুর্গ নির্মাণ বিদ্যা, যুদ্ধ উপকরণ স্থানান্তরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে নিজেদের গর্বিত মনে করে এবং একই সঙ্গে গেরিলা যোদ্ধাদের প্রতি উন্নাসিক হয়, এই দুই শ্রেণী কখনই সহাবস্থান করতে পারে না।

অবশ্যই এমন কিছু কিছু সামরিক ব্যক্তি যারা অতীতকে পিছনে ফেলে নতুন সংগঠনে পুরোপুরি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যোগ দেন। দুদিক থেকে এদের সাহায্য পাওয়া যায়, কারণ জনগণের প্রতি তাদের ভালবাসার সঙ্গে জনগণের নতুন বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের জ্ঞান কাজে লাগত। পুরানো সামরিক সংগঠন ভেঙে ফেলার পরে সংস্থা হিসাবে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় ; পুরানো বাহিনীর পদগুলি নতুন বাহিনীর যোদ্ধারা দখল করার পরে দেখা যায় নতুন বাহিনী পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, পূর্বতন গেরিলা চরিত্র যেখানে পরিকল্পনাহীনভাবে কিছু গেরিলা কম্যাণ্ডারের অধীনে গেরিলারা কাজ করে সেই ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। নীতিনির্ধারক হিসাবে কিন্তু গেরিলা দলের কর্মভাবনাকে স্থান দিতেই হবে। ভুলত্রুটি এড়ানোর জন্য যথোচিত ব্যবস্থা নিতে হবে যখন প্রথম কিছুদিন ধরে পুরানো সামরিক শৃঙ্খলা এবং সংগঠনের জায়গায় আমরা নতুন গণবাহিনী গঠন করব। এই ধরনের ত্রুটির সাথে চরম অব্যবস্থা সংগঠনের সামগ্রিক ক্ষতি করতে পারে। কাজেই উত্তরণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে খুব সাবধানে।

নতুন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে। এই যুদ্ধটা লড়বে গণবাহিনী যার নেতৃত্বের স্বাধীনতা, প্রত্যেকটি সাধারণ সংগ্রামে দলগুলির নিজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থা থাকবে। এই বাহিনীর দুটি আশু সমস্যা আছে—প্রথমটি, মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ভাল-মন্দ মিলিয়ে যে হাজার হাজার বিপ্লবী যোগ দিয়েছে, তাদের দরকার গেরিলার কঠিন জীবনের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং আরও দরকার দ্রুত তাদের বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত করা। বিপ্লবী শিক্ষা যোগায় গণবাহিনীর অবশ্য প্রয়োজনীয় আদর্শগত ঐক্য। অন্য সমস্যাটা হল নতুন সাংগঠনিক কাঠামোয় মানিয়ে চলার অসুবিধা।

গণবাহিনীর সমস্ত ইউনিটের ভিতরে বিপ্লবী সত্য ছড়িয়ে দেবার কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য একটি দলকে যত শীঘ্র সম্ভব তৈরি করা উচিত। সমস্ত কৃষক, শ্রমিক এবং সৈন্যদের কাছে যারা এসেছে, জনগণের মধ্য থেকে এরা ব্যাখ্যা করবে প্রত্যেকটি বিপ্লবী কাজের মধ্যে ন্যায়ের ধারণা, বিপ্লবের উদ্দেশ্য, কেন যুদ্ধ লড়তে হয়েছে, কেন এত তরতাজা প্রাণ জয়লাভের আগেই নির্বাপিত হয়েছে। এইসব তীব্র মতবাদে দীক্ষিত করার পাশাপাশি নিরক্ষরতা দূরীকরণে জোরদার কাজ করতে হবে, যাতে বিদ্রোহী বাহিনী ধীরে ধীরে এমন স্তরে উন্নীত হতে পারে, যখন উচ্চতর কারিগরী জ্ঞান থাকবে তাদের দৃঢ়বদ্ধ আদর্শগত ভিত্তি এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ ক্ষমতা হবে তাদের করায়ত্ত।

এই তিনটি গুণাবলী বিকশিত হবে সময়ের সাথে সাথে। সামরিক সংগঠনটি সময়ে নিখুঁত হয়ে উঠবে। পূর্বতন যোদ্ধারা বিশেষ ধরনের শিক্ষা নিয়ে পেশাদার সামরিক ব্যক্তি হয়ে উঠবে, যারা আবার স্বেচ্ছাসেবক বা বাধ্যতামূলকভাবে যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে তাদের সারা বছর ধরে শিক্ষাদান করবেন। জাতীয় চরিত্রের উপর এই পদ্ধতিটি নির্ভর করবে এবং কোনমতেই একে আদর্শ বলে পেশ করা যাবে না।

বিদেশী আগ্রাসনের হুমকি, ১৯৫৯-এর শেষভাগে এবং ১৯৬০-এর প্রারম্ভে আধুনিক পৃথিবীর পরিস্থিতি ইত্যাদি বিচার করে শত্রু যখন দ্বারপ্রান্তে, তখন কিউবার বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব কিভাবে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করেছিল সেটাই আমরা প্রকাশ করতে চেয়েছি। অন্যকথায়, অন্যান্যদের জন্য আমরা এটাকে একটা তত্ত্বকথা বলে চালাতে চাইছি না। বরং অন্যরা কি করেছে তার অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা আমাদের জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সেটা প্রয়োগ করতে চাইছি।

যেহেতু আমাদের সমস্যা হল কিউবার উদাহরণটাকে তত্ত্বে পরিণত করা, আমেরিকান বাস্তবতার নিরীখে আমাদের অনুমিতির সঠিক অবস্থান নির্ণয় ও পরীক্ষা নেওয়া, তাই আমরা নিম্নলিখিত উপসংহারটির অবতারণা করছি :

৩. উপসংহার

কিউবার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ : বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

একবছর হয়ে গেল একনায়ক পালিয়ে গেছে, কিউবার জনগণের দীর্ঘ অসামরিক ও সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য বিশাল ; তা সত্ত্বেও সেগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে আর তার প্রতিটি ফলাফলকে পর্যালোচনা করে জনগণকে দেখাতে হবে কিউবার বিপ্লবের সঠিক মূল্যায়ণ। এই জাতীয় বিপ্লব, মূলত যার প্রকৃতি কৃষিভিত্তিক, শ্রমিক মধ্যবিত্ত এবং এমনকি শিল্পপতিদের উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থনে মহাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী এক অভূতপূর্ব গুরুত্ব অর্জন করেছে, জনগণের অনমনীয় সংকল্প এবং উৎসাহের ফলে তা সুরক্ষিত।

জনগণের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত আইন পাশ করা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত আকারে

প্রকাশ করার চেষ্টা আমরা করছি না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিউবার জনগণের স্বার্থে প্রগতিশীল এবং প্রয়োজনীয়তার ক্রমপর্যায়ে কতটা যুক্তিপূর্ণ হয়েছে আইনগুলি সেটি বোঝা যাবে কতকগুলি আইনের উপর আলোকপাত করলেই।

বাড়ি ভাড়া আইন, বিদ্যুৎ মাশুল হ্রাস এবং টেলিফোন কোম্পানীতে হস্তক্ষেপ যার ফলশ্রুতিতে 'কল চার্জ'-এর মূল্যহ্রাস—এই পরপর আইন জারী সংকেত ঘণ্টা বাজাল দেশের পরজীবী শ্রেণীর শিবিরে।

ফিদেল কাস্ত্রো এবং তার সহযোগীরা যারা বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল, তাদের যারা ভেবেছিল পুরানো ধাঁচের রাজনীতিক, পার্থক্য কেবল তারা দাড়িওলা কিছু বোকা লোক, এখন সন্দেহ করতে শুরু করল যে, কিউবান জনগণের অন্তর থেকে উৎসারিত হচ্ছে আরও কিছু গভীর উদ্দেশ্য, যার জন্য তাদের সুযোগ সুবিধা লোপ পেতে বসেছে। নেতৃত্বের মানুষগুলি এবং বিজয়ী গেরিলা যোদ্ধাদের চতুস্পার্শ্বে ঘোরাঘোরা করতে শুরু করল "কমিউনিজম" শব্দটি। স্বভাবতই দ্বন্দ্বমূলকভাবে পুরোপুরি বিপরীত "কমিউনিজম বিরোধী" শব্দটি আকর্ষণ করল সেই সমস্ত ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে, যারা অন্যায় বৃত্তির ফায়দা থেকে অধিকারচ্যুত হচ্ছিল। পতিত জমি সংক্রান্ত আইন এবং কিস্তিতে টাকা প্রদান করা সংক্রান্ত আইন দুটি সুদখোর পুঁজিপতিদের অসহিষ্ণুতা আরও বাড়িয়ে দিল। কিন্তু এগুলো ছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে ছোট মাপের ঠোকাঠুকি। তখনও পর্যন্ত সব ঠিক ছিল এবং সম্ভবত ফিদেল কাস্ত্রো নামক "পাগল লোক"-টাকে হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পথে আনা যেতে পারে মহান "গণতন্ত্রের পথে", এই আশা রাখছিল তারা। ভবিষ্যতের প্রতি প্রত্যেককে বিশ্বাস রাখতে হবে।

ভূমিসংস্কার আইন নিয়ে এল এক ভয়ঙ্কর ধাক্কা, পরিস্কার বোঝা গেল তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ায় প্রথম সারিতে থাকা গাসতন বাকেরো গলা ফাটালো এই বলে যে কি হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে সে ঠিকই আগাম অনুমান করেছিল ; অবসর নিয়ে সে, স্পেনীয় একনায়কদের ছত্রচ্ছায়ায় শান্তিতে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখনও পর্যন্ত কয়েকজন ছিল যারা বিশ্বাস করত আইন হ'ল কথার কথা, অন্যান্য সরকারগুলো একই রকমের আইন প্রবর্তন করেছিল, খাতায় কলমে তা ছিল জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী ; কিন্তু এইসমস্ত আইনগুলোকে কাজে পরিণত করা অন্য জিনিস। এই অবাধ্য এবং দুর্বোধ্য সন্তানের নামকরণ হল ইনরা (INRA)*— যা জ্ঞানের গজদন্তমিনার থেকে মনে করা হল বিরক্তিকর এবং স্পর্শকাতর স্বাধীনতা হরণকারী ; ছড়িয়ে পড়ল তার সামাজিক মতবাদ, গালভরা তত্ত্বকথা, পাবলিক ফিনান্স ইত্যাদি গেরিলা যোদ্ধার অসংস্কৃত এবং উদ্ভট মানসিকতার মাথার উপর দিয়ে খেলে গেল। কিন্তু 'ইনরা' এগিয়ে চলল ট্রাক্টর বা যুদ্ধ ট্যাঙ্কের মত বিরাট বিরাট জমিদারীর দেওয়ালকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, সৃষ্টি করল এক নতুন জমি মালিকানার সামাজিক সম্পর্ক। আমেরিকাতে এই কিউবান ভূমি সংস্কারের উত্থান হল অনেক গুরুত্বপূর্ণ

* INRA : National Institnte of Agarian Reform

বৈশিষ্ট্য নিয়ে। অবশ্যই এটি সামন্ততন্ত্রবিরোধী এই অর্থে যে কিউবার বিশেষ জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ হল, শস্যের বিনিময়ে জমির খাজনা দেবার সমস্ত চুক্তি বাতিল হল এবং আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য কফি এবং তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে গোলামি প্রথা ছিল তার উৎখাত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় যে একচেটিয়া ব্যবস্থা মানুষের সম্ভাবনাকে, তা সে বিচ্ছিন্ন অথবা সম্মিলিত যাই হোক না কেন পিষে মারে, তার বিরুদ্ধে এ প্রকৃতই এক ভূমি-সংস্কার ; আমাদের সংস্কার কৃষককে তার জমিতে সম্মানজনকভাবে কাজ করতে এবং সুদখোর মহাজন এবং ভূস্বামীর ভীতি ছাড়াই পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করেছে। শুরু থেকেই, কৃষক এবং কৃষি-শ্রমিকদের দরকারী সমস্ত কারিগরী সহায়তা, যন্ত্রপাতি এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের ঋণের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 'ইনরা' অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং ওরিয়েন্তে প্রদেশে নির্মিত এবং অন্যান্য প্রদেশে নির্মীয়মান Association for People's Store থেকেও উল্লেখযোগ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সমবায় সমিতি পুরানো মালিকদের বিদায় করে অর্থসাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি ন্যায্য দামে শস্য কিনত।

যে সমস্ত বৃহৎ কৃষি সংস্কার আমেরিকায় (মেক্সিকো, গুয়েতামালা ও বলিভিয়া) হয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে কিউবার সংস্কারের একটি অনন্য বিশেষত্ব আছে—যেটি হল কোনরকম ছাড় বা ব্যতিক্রম ছাড়া এটিকে সব জায়গায় চালু করা। এই কৃষি সংস্কারে জনগণের অধিকার ছাড়া অন্য কোন অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, শ্রেণী বা জাতির ভিত্তিতে কোন ভেদাভেদ না মেনে আইনের শাসন যেমন নেমে আসত ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানী এবং কিং র‍্যাঞ্চের উপর, তেমনই বড় বড় ক্রেওলে জোতদারদের উপর।

এই পরিস্থিতিতে জমি তৈরি করা হয়েছে দেশের প্রয়োজনভিত্তিক শস্য উৎপাদনের জন্য—ধান, তেল-উৎপাদনকারী শস্য এবং তুলো—এর উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু দেশ এতেই সন্তুষ্ট নয় এবং চায় তার লুট হয়ে যাওয়া সম্পদ উদ্ধার করতে। মাটির তলার দামী তেল যা নিয়ে ছিল একচেটিয়া পুঁজিপাতিদের উদগ্র লোভ আর কামড়াকামড়ি, তা উদ্ধার করে নেওয়া হল পেট্রোলিয়াম আইনের মাধ্যমে। এই আইনটি ভূমি সংস্কারের এবং বিপ্লব পরবর্তী সময়ে নেওয়া অন্যান্য ব্যবস্থার মত কিউবার মুক্তিকামী জনগণের আশু দাবিগুলির প্রতি নজর রেখে অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলির প্রয়োজন মেটাতে তৎপর হল; কেননা জনগণ চায় নিজের অর্থনীতির নিয়ামক হতে, চায় সমৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নতির উচ্চতম সোপান স্পর্শ করতে। কিন্তু এই কারণে মহাদেশের তেলের একচেটিয়া কারবারীরা ভয় পেয়ে গেল। এমন নয় যে কিউবা পেট্রোলিয়ামের একচেটিয়া অধিকারে খুব একটা বিরাট ধাক্কা দিতে পেরেছিল ; একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে দেশটি খুব পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ। যদিও একটা যুক্তিগ্রাহ্য আশা জিয়ানো ছিল যে, আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর মত একটা সরবরাহ পাওয়া যাবে। কিন্তু কিউবার এই আইন একটা জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরেছিল আমেরিকার ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সামনে, যাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর

প্রতিযোগিতারত ট্রাষ্টগুলির উত্তরোত্তর খিদে মেটানোর তাগিদে হয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অত্যাচারে ধ্বস্ত হয়েছিল, অথবা নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল ; সেখানে কিউবা দেখিয়ে দিল আমেরিকাতে কি করা সম্ভব এবং ঠিক কোন্ মুহূর্তে আঘাতটা হানা উচিত। বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কিউবার প্রতি অস্বস্তিকর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। ছোট্ট ক্যারিবিয়ান দ্বীপ কিউবা যে শুধু মহাক্ষমতাশালী ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর (মিঃ ফসটার ডালেসের উত্তরাধিকারী) স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করল তাই নয়, রকফেলার এবং ডয়েটস গ্রুপের সাম্রাজ্যেও চিড় ধরিয়ে ছিল ক্যবার বিপ্লবের আগ্রাসী কশাঘাত।

এই আইনটি, খনি আইনটির মতই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও তাদের উপর নেমে এসেছে শক্তিপ্রদর্শনের ভীতি, এমনকি বিমান আক্রমণ, এছাড়া সবরকমের শাস্তি খাঁড়া। অনেকে বলেন খনি আইন ভূমি সংস্কারের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে, আমরা এটিকে দেশের অর্থনীতিতে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না, কিন্তু একটি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল এটি : রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর ২৫% কর দিতে হবে কোম্পানিগুলিকে, যারা আমাদের খনিজ বিক্রী করবে বিদেশে (যাতে তাদের মাটিতে গর্ত করার পাশাপাশি অন্য কিছুও দিতে হয়)। এটাতে যে কেবলমাত্র কিউবার জনগণের কল্যাণ সাধিত হল তাই নয়, আমাদের নিকেলের বর্তমান শোষকদের সঙ্গে যুযুধানরত কানাডিয়ান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আপেক্ষিক শক্তিবৃদ্ধি হল। এইভাবে কিউবার বিপ্লব জোতদারদের হঠাল, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফায় রাশ টানল, বিদেশী মধ্যাস্থতাকারীদের মুনাফাতেও দাঁড়ি টানল, যারা আমদানী ব্যবসায়ে তাদের পরজীবী পুঁজিকে কাজে লাগত—এক নতুন নীতির আমদানি করল আমেরিকায় যা খনি দৈত্যদের একচেটিয়া আধিপত্যকে ভেঙে দেবার সাহস দেখাল, অন্তত তাদের একজনকেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। একটি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বর্গরাজ্যের প্রতিবেশীদের প্রতি এই পদক্ষেপ এক নতুন আহ্বান পৌঁছে দিল যার প্রতিধ্বনি শোনা গেল সমগ্র মহাদেশে। কিউবান বিপ্লব ভেঙে ফেলল সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবন্ধকতা এবং উন্নততর জীবনের আকাঙ্খাকামী আমেরিকান জনগণের প্রতি তার বার্তা পৌঁছে দিল ধূলোর ঝড়ের মত। নতুন জাতিসত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল কিউবা, আর মুক্তির প্রতীক ফিদেল কাস্ত্রো।

অভিকর্ষের এক সাধারণ নিয়মের বলে ১,১৪,০০ বর্গকিলোমিটার এবং ১৫ লক্ষ অধিবাসীর এই ছোট্ট দ্বীপটি আমেরিকাতে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্বে অভিষিক্ত হল। অন্যান্য দেশগুলির দ্বিধাগ্রস্ততার প্রেক্ষাপটে কিউবার এই বীরত্বব্যঞ্জক, উজ্জ্বল, আবার একই সঙ্গে বিপজ্জনক ভূমিকা তাকে গৌরবের আসনে বসিয়েছে। ঔপনিবেশিক আমেরিকায় যে সব দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, সেখানে জাতীয় পুঁজিবাদের বিকাশ থমকে আছে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিরামহীন এবং সময়ে সময়ে হিংস্র লড়াইয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, তারাও এখন এই মুক্তির স্বাদ পাওয়া ছোট্ট দেশটির দিকে তাকিয়ে, কেননা তাদের সরকারগুলির লড়াই করার মত সামর্থ নেই। এটা খুব সোজা কাজ ছিল না। বিপদ এবং অসুবিধাও ষোল আনা, কিন্তু আদর্শবাদে

দীক্ষিত সমস্ত জনগণের সমর্থন এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা থাকলে তা সম্ভব। কয়েকটি ছোট দেশ এই ভূমিকা নিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল গুয়াতেমালার আগে : কেতজালের গুয়াতেমালার খাঁচায় বন্দী অবস্থায় মারা গিয়েছিল, ইণ্ডিয়ান তেকুস উসানের গুয়াতেমাল ঔপনিবেশিকদের প্রত্যক্ষ আক্রমণে ছারখার হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক শহীদ মুরিইও-র দেশ বলিভিয়া সংগ্রামের ভয়ঙ্কর কঠোরতার মধ্য দিয়ে তিনটি উদাহরণ তুলে ধরেছিল যা কিউবান বিপ্লবের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল : পুরানো সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করা, ভূমিসংস্কার এবং খনি জাতীয়করণ—সম্পদের যা বৃহত্তম উৎস, একই সঙ্গে বিয়োগান্তক কাহিনীরও।

কিউবা এই সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাদের ব্যর্থতা এবং অসুবিধা সম্পর্কেও, কিন্তু কিউবা এটাও জানে, আমরা পৃথিবীর এক নতুন যুগের ভোরের সূর্য ওঠার অপেক্ষায় ; এশিয়া এবং আফ্রিকাতে জাতীয় ও গণসংগ্রামের তীব্রতার মুখে ঔপনিবেশিকতাবাদের খুঁটিগুলো উপড়ে যাচ্ছে। এখন জনগণের ঐক্য আর নির্ভর করে না ধর্ম, আচার, ইচ্ছা, জাতিগত ঐক্য বা অনৈক্যের উপরে, তা জন্ম নেয় একই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে, আর একই ধরণের প্রগতি আর ফিরে পাওয়ার আকুলতা থেকে। এশিয়া আর আফ্রিকা হাত মিলিয়েছে বান্দুং-এ*, এশিয়া ও আফ্রিকা ঔপনিবেশিক ও দেশজ আমেরিকার সঙ্গে এসে হাত মিলিয়েছে কিউবার মাধ্যমে, এখানে এই হাবানায়।

অন্যদিকে বৃহৎ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি গণসংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে। বেলজিয়াম আর হল্যাণ্ডের শুধু সাম্রাজ্যের তকমাটাই আছে। জার্মানী আর ইতালী তাদের উপনিবেশগুলি হারিয়েছে। এক প্রবল যুদ্ধে ফ্রান্স হেরেছে।** কুটনীতিক এবং ধড়িবাজ ইংল্যাণ্ড রাজনৈতিক ক্ষমতা সরিয়ে রেখে অর্থনৈতিক যোগাযোগ রাখতে চাইছে।

স্বাধীনভাবে জীবন শুরু করা কিছু দেশে উত্তর আমেরিকান পুঁজিবাদ পুরানো ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদের জায়গা নিয়েছে, কিন্তু সে ভাল করেই জানে এ কেবল সাময়িক এবং এই সমস্ত নতুন অঞ্চলে তাদের অর্থবিনিয়োগের কোন নিরাপত্তা নেই, অক্টোপাশের শুঁড়গুলো পাকাপোক্তভাবে চেপে বসতে পারবে না সেখানে। সাম্রাজ্যবাদী ঈগলের নখ ক্ষয়ে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিকতাবাদ মারা গেছে অথবা এইসমস্ত দেশে তার স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

আমেরিকা একটু অন্য ধরনের। বৃটিশ সিংহ তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে বিদায় নিয়েছে, তারপরেই মনোমুগ্ধকর যুবক ইয়াংকি পুঁজিবাদীরা বৃটিশ অভিজাতদের নবতম গণতন্ত্রের ধারণা চালু করেছে, তাদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ২০টি প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেকটির উপরে চাপিয়ে দিয়ে।

এটাই হল উত্তর আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রাজত্ব, তাদের অস্তিত্ব এবং

---

*১৯৯৫ সালে, প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ—এই আন্দোলনই পরে পরিবর্তিত হয় জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির আন্দোলনে।

**আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

শেষ আশা, তার "বাড়ির পিছনের উঠান"। যদি কিউবার মত লাতিন আমেরিকার জনগণ তাদের মর্যাদার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা কম্পিত হবে; তাকে নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে এবং তার মুনাফায় কাঁটছাট অবশ্যম্ভাবী। এই মুনাফা কমে যাওয়া ব্যাপারটা তারা একদমই পছন্দ করে না, কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদাবোধের এই "খারাপ উদাহরণ"টা আমেরিকার দেশগুলিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখনই কোথাও দুর্বিনীত জনগণ মুক্তির জন্য চিৎকার করে, গাল পাড়া হয় কিউবাকে; কিউবা দোষী কেননা সেই পথ দেখিয়েছে কেমন করে অজেয় বলে ধরে নেওয়া সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম লড়া যায়, কেমন করে বন্ধুর অঞ্চলে লড়াই করে শত্রুকে তাঁর ঘাঁটি থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তছনছ করে ধ্বংস করা যায়, এককথায় যা তাদের মর্যাদাবোধের প্রতীক।

সত্যিই তো এই কিউবান উদাহরণটা খুবই খারাপ, এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদ শান্তিতে ঘুমাতে পারে না যতক্ষণ তার নাকের ডগায় আছে এই বাজে উদাহরণ, পদে পদে বিপদের সৃষ্টি করছে, ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাই তারা ঘোষণা করে, একে ধ্বংস করতে হবেই। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পদলেহনকারী ভৃত্যরা আওয়াজ তুলেছে "সাম্যবাদের" এই দুর্গে হস্তক্ষেপ করো। ট্রাস্টের কৌশলী রক্ষাকর্তারা বলে ওঠে "কিউবার পরিস্থিতি খুব বিরক্তিজনক।" তারা কি বলতে চায় আমরা জানি : "একে ধ্বংস করো।"

তাই, কতরকম উপায় আছে হামলা করে এই খারাপ উদাহরণটিকে ধ্বংস করার? একটা সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক। এটা শুরু হল যখন সমস্ত ব্যবসায়ীদের জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে, এমনকি কিউবার জাতীয় ব্যাঙ্ককে ধার দেওয়া বন্ধ করেছে উত্তর আমেরিকান ব্যাঙ্কগুলি। এবং তাদের সহযোগী হিসাবে একই ধরনের নীতি অনুসরণ করেছে পাশ্চাত্যের ইউরোপিয়ান দেশগুলি। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়।

ধার না দেওয়াটা প্রথমে অর্থনীতিতে তীব্র আঘাত হানে, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার থেকে মুক্তিও ঘটে দ্রুত, বাণিজ্যিক স্থিতি আসতে থাকে, কেননা বলি হওয়া দেশটি জানে কিভাবে তাকে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তাই আরও চাপ দাও। এইবার প্যাঁচ কষে চিনি নিয়ে : হ্যাঁ, না, না, হ্যাঁ। পাগলের মত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এজেন্টদের গণনাযন্ত্রগুলো হিসেবনিকেশ করে বলে এবং অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় কিউবান কোটা কমিয়ে দেওয়াটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে এবং তা বাতিল করাও অসম্ভব। কেন বিপজ্জনক? না, নোংরা রাজনীতির বাইরেও, অন্যান্য ১০ থেকে ১৫টা সরবরাহকারী দেশের লোভ বেড়ে যাবে তাতে, তারা সবাই মনে করবে তারই বেশি ভাগ পাওয়া উচিত। অসম্ভব এইজন্য যে, কিউবা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে দক্ষ এবং সবচেয়ে সস্তাতে সরবরাহকারী; মার্কিনীদের ৬০% লাভ আসে কিউবা থেকে বাণিজ্য করে। এর উপর যে বিক্রী করবে না, সে কিছু কিনবেও না, এবং এটা চুক্তিভঙ্গের একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। উত্তর আমেরিকা যে বাজারদর থেকে ৩ সেন্ট বেশি দেয়, তার কারণ তাদের সস্তায় চিনি উৎপাদনের অক্ষমতা। উচ্চ মজুরী এবং মাটির নিম্ন উৎপাদনশীলতার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলির কিউবার দরে চিনি উৎপাদন করা সম্ভব নয়। বেশী দাম দেওয়ার সুযোগ নিয়ে শুধু কিউবা নয়, অন্যান্য দেশগুলোর উপর তারা দুর্বহ কিছু চুক্তি চাপিয়ে দেয়। তাই কিউবান কোটা মুছে দেওয়া সম্ভব নয়।

এটা আমরা মনে করি না যে, কোন অর্থনৈতিক কারণে চিনির উৎপাদন কমাবার জন্য আখের ক্ষেতে একচেটিয়া পুঁজিপাতিদের বাহিনী বোমাবর্ষণ করেছে। বরং এটা করা হয়েছে বিপ্লবী সরকারের কর্তৃত্বের উপর আস্থা হ্রাস করার জন্য এক পরিকল্পিত আক্রমণ। (উত্তর আমেরিকান ভাড়াটে সৈন্যের মৃতদেহ একটি ক্যুবান বাড়িতে রক্ত লাগিয়ে কলুষিত করেছে, একটি নীতিকেও কলুষিত করেছে একই সঙ্গে।* কি বলা যাবে প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত অস্ত্রশাস্ত্রের বিরাট বিস্ফোরণ সম্বন্ধে?**)

কাঁচা মাল যেমন, তুলোর সরবরাহ বন্ধ করা ক্যুবান অথনীতিতে ধাক্কা মারার আর একটি উপায়। এটা সর্বজনবিদিত যে, বিশ্বে তুলো উৎপাদন বেশ বেশি। তাই এ ব্যাপারটাও কার্যকরী হবে না। তেল? এ ব্যাপারটায় নজর দেওয়া যেতে পারে। তেল সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করে একটা দেশকে পঙ্গু করা যায়, আর কিউবা খুব অল্প পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করে, তার কিছু ভারী তেল দিয়ে কেবল বাষ্প-চালিত যন্ত্রপাতি চালানো যায়। গাড়িতে কিছু এ্যালকোহল ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বে পেট্রোলিয়াম অনেক জায়গায় আছে। মিশর বিক্রি করতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়নও পারে, সম্ভবত ইরাকও হাত বাড়িয়ে দেবে। তাই পুরোপুরি অর্থনৈতিক কৌশলে কাজ হচ্ছে না।

অর্থনৈতিক আক্রমণের সাথে সাথে আরেকটা আক্রমণের পন্থা হচ্ছে কোন পুতুল শক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারে; উদাহরণস্বরূপ দোমিনিকান রিপাবলিকে যেমন নোংরা ব্যাপার করা হয়েছিল, মুশকিল হল তাতেও বাদ সাধতে পারে রাষ্ট্রপুঞ্জ। তাই কার্যকরী কিছুই করা যাচ্ছে না।

ঘটনাচক্রে অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস যে নতুন পথ নিয়েছে তা এক বিপজ্জনক হস্তক্ষেপের সামিল। ত্রুহিইওর মোড়কের আড়ালে আগ্রাসনের পথ খুঁজে বার করে সান্ত্বনা পায় একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এটা খুব দুঃখজনক যে, ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক সরকার ত্রুহিইওর বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে আমাদের এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। মহাদেশের জলদস্যুদের বড় সুবিধা করে দিল তারা!

আগ্রাসনের নতুন সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে একটা হল সেই "পাগল ছেলে" ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যা করা, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্রোধের কেন্দ্রবিন্দু সেই। স্বভাবতই আরও দুজন বিপজ্জনক "আন্তজার্তিক এজেন্ট" রাউল কাস্ত্রোকে এবং এই লেখককে সরিয়ে দিতে হবে। এই সমাধানটি বেশ আকর্ষক, যদি তিনজনের উপরে উপর্যুপরি অথবা একজনের উপরে আক্রমণও সফল হয়, তাহলে প্রতিক্রিয়াশীলদের জয়জয়কার। (তবে জনগণকে ভুলে যাবেন না মহামান্য পুঁজিপতিরা, এরকম কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সর্বশক্তিমান জনগণ বিপ্লবের যে কোন নেতার প্রতি আক্রমণের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও জড়িতদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তাদের ধরে রাখে সাধ্য কার?)

---

*১৯৬০-এর ফেব্রুয়ারিতে ক্যুবার মাটিতে নিজের বোমাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একটি বিমান ভেঙে পড়ে, পাইলট মারা যায়, পরে প্রকাশ পায় যে মার্কিন নাগরিক।

**৪ঠা মার্চ ১৯৬০-এ একটি বেলজিয়ান জাহাজ অস্ত্র নিয়ে আসছিল, হাবানা বন্দরে তার বিস্ফোরণে ৭২ জন প্রাণ হারায় এবং ২০০ জনের বেশি আহত হয়।

গুয়াতেমালার মত আক্রমণের আর একটা পন্থা হল অস্ত্র সরবরাহকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে কিউবাকে বাধ্য করা কমিউনিস্ট দেশগুলির কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে। এইটাকে ছুতো করে একদফা অপমান করা যাবে তাকে। আমাদের সরকারের একজন বলেছেন, "হতে পারে ওরা কমিউনিস্ট বলে আমাদের আক্রমণ করবে, কিন্তু আমরা এতটা আহাম্মক নই যে আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারবে।"

তাই প্রত্যক্ষ আক্রমণটা মনে হয় দরকারী হয়ে পড়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে। সবকিছু সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে IBM মেশিনে, তার ফলাফল তো বটেই। মনে হচ্ছে স্পেনীয় ধরণ প্রয়োগ করা হতে পারে। এটা হল এমন এক ধরনের ষড়যন্ত্র যে, নির্বাসিত প্রতিক্রিয়াশীলরা স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিয়ে আক্রমণ করবে, অবশ্যই স্বেচ্ছাসেবক হচ্ছে ভাড়াটে সৈন্য অথবা সোজাসুজি বিদেশী শক্তির সৈন্যবাহিনী, যারা সমুদ্র এবং আকাশ থেকে সাহায্য পাবে। দোমিনিকান রিপাবলিকের মত কিছু রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আক্রমণের মধ্যে এটা আরম্ভ হতে পারে ; তারা আমাদের ভ্রাতৃসম কিছু লোককে পাঠাবে, সঙ্গে থাকবে অনেক ভাড়াটে সৈন্য, যারা আমাদের সমুদ্রসৈকতে প্রাণ বিসর্জন দেবে যাতে একটা যুদ্ধের প্ররোচনা সৃষ্টি করা যায়। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পুঁজিপতিরা বলবে তারা এই ভাইয়েদের মধ্যে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। কিন্তু তারা আকাশ এবং সমুদ্রপথে কড়া নজরদারি রাখবে আমেরিকার এই অংশে, এর জন্য নিয়ে আসা হবে, ক্রুইজার, যুদ্ধজাহাজ, ডেষ্ট্রয়াব, বিমানবাহী জাহাজ, সাবমেরিন, মাইনপ্রতিরোধক, টর্পেডো এবং অবশ্যই যুদ্ধবিমান। এটাও হতে পারে যে মহাদেশীয় শান্তির এই পরশ্রীকাতর অভিভাবকরা কোনও কিছু জিনিস নিয়ে আসা নৌকা কিউবাতে ভিড়তে দিচ্ছে না। তখন ক্রুহিইও-র দেশের দিকে যে নৌকাগুলি যাচ্ছে সেগুলি এই লৌহ যবনিকা ভেদ করতে সক্ষম হল। তাছাড়াও কিছু নামী আন্তঃ আমেরিকান সংস্থার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ চালানো হতে পারে, উদ্দেশ্য "সাম্যবাদ" যে যুদ্ধ শুরু করেছে আমাদের দ্বীপরাষ্ট্রে তার অবসান করা। আর যদি এই নামী আমেরিকান সংস্থার কৌশল কাজে না আসে, তারা সরাসরিই হস্তক্ষেপ করবে, যেমন তারা করেছে কোরিয়াতে. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃত্বে তাদের নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা ও শান্তি রক্ষার তাগিদে করা যেতে পারে এই হস্তক্ষেপ।

হয়তো আগ্রাসনের প্রথম পদক্ষেপ আমাদের বিরুদ্ধে করা হবে না, হবে ভেনেজুয়েলার সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে, উদ্দেশ্য মহাদেশে আমাদের শেষ সমর্থনটাকে সরিয়ে দেওয়া। এটাও সম্ভব যে ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু কিউবা থেকে (সিমন) বলিভারের মহান দেশে স্থানান্তরিত হবে। প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঙ্গে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত হবে ভেনেজুয়েলার জনগণ, যাদের চেতনায় আছে যে তারা একটা নির্ণায়ক লড়াই লড়ছে, যেখানে পরাজয় মানে জঘন্য অত্যাচার আর জয় এনে দেবে আমেরিকার নিশ্চিত ভবিষ্যত। গণসংগ্রামের ঢেউ আমাদের প্রতিবেশী প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কবরের শান্তিভঙ্গ করতে পারে।

শত্রুর জয়ের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে অনেকগুলি কারণ কাজ করে। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে প্রধান। প্রথমটি, বৈদেশিক : এখন ১৯৬০ সাল, অনুন্নত জনগণের বছর, মুক্ত জনগণের বছর, এই সেই বছর যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর মর্যাদা পাবে যারা যথেষ্ট ভাগ্যবান, কেননা, তারা মৃত্যু এবং অর্থের কারবারীদের দ্বারা শাসিত নয়। এ ছাড়াও একটি আরও

বেশি শক্তিশালী যুক্তি—৬০ লক্ষ কিউবানের হাতে আছে অস্ত্র এবং তারা হাতে হাত মিলিয়ে তাদের মাতৃভূমি বিপ্লবকে রক্ষা করবে, যেখানে সৈন্যবাহিনী আর সমস্ত জনগণ সমার্থক। যদি সামনাসামনি যুদ্ধে পরাজয়ও হয়, একটি নেতৃত্বের অধীনে এবং একটি মতাদর্শগত কেন্দ্রের নির্দেশে শত শত গেরিলা সারা দেশে যুদ্ধ করবে। শহরে শ্রমিকরা তাদের ফ্যাক্টরীতে অথবা কাজের জায়গায় প্রাণ দেবে, গ্রামে কৃষকেরা প্রতিটি পামগাছ আর বিপ্লবের উপহার যান্ত্রিকভাবে লাঙল-দেওয়া জমি থেকে লড়াই চালাবে আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে।

এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লক্ষ-লক্ষ মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি সৃষ্টি করবে এক ব্যারিকেড। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দেখবে কিভাবে তাদের স্তম্ভগুলো নড়ে যাচ্ছে আর সংবাদপত্রের মিথ্যা প্রচার কিভাবে এক লহমায় ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ধরে নিলাম এই গণপ্রতিরোধকে তারা উপেক্ষা করল, কি হবে তখন?

প্রথমে এটা মনে রাখা দরকার, ভারী অস্ত্র ছাড়া, দুর্বল বিমান ও নৌবাহিনী নিয়ে আমাদের দ্বীপ সত্যিই তেমন সুরক্ষিত নয় ;তাই জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই চালাতে গেরিলা যুদ্ধের ধারণাটাই প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের স্থলবাহিনী ঐকান্তিকতা, অঙ্গীকার আর চূড়ান্ত উৎসাহ নিয়ে কিউবান বিপ্লবের সম্ভাবনার ইতিহাসের এই উজ্জ্বল অধ্যায়ে লড়াই করবে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপটাই ভেবে নিই, যদি আমাদের সামরিক সংগঠন ধ্বংস হয়ে যায় সামনাসামনি যুদ্ধে, তাহলেও আমরা হার মানব না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরিবর্তিত হয়ে যাব গেরিলাবাহিনীতে যাদের গতিবিধি সর্বত্র। আমাদের কলাম কম্যাণ্ডারদের অসীম কর্তৃত্ব থাকলেও দেশের কোন স্থানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় আদেশ দেবে এবং রণকৌশল ঠিক করবে। বিদ্রোহী বাহিনীর শেষ প্রতিরোধ হবে পর্বতে। কিন্তু প্রতিটি বাড়িতে, রাস্তায়, প্রতিটি জঙ্গলে, দেশের প্রতিটি কোণে লড়াই চালাবে দেশের মানুষ পশ্চাদবাহিনী হিসাবে। সমস্ত জনগণকে প্রশিক্ষিত করা হবে এবং সশস্ত্র লড়াইয়ের উপযোগী করে তুলতে হবে।

ভারী অস্ত্র হাতে না থাকায় স্থলবাহিনী ট্যাঙ্ক ও বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষার কৌশল শেখার দিকে নজর দেবে। বিপুল সংখ্যায় মাইন, বাজুকা অথবা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গ্রেনেড, বিমান বিধ্বংসী কামান আর মর্টার ব্যাটারী আমাদের উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী অস্ত্র। সশস্ত্র প্রবীন যোদ্ধারা গোলাবারুদের মূল্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেগুলি পাহারা দেবেন। প্রত্যেক সৈন্যদলের সঙ্গে খালি শেল ভর্তি করার জন্য একটি বিশেষ দল থাকবে, তাতে গুলিগোলা ঠিকমত সংরক্ষিত থাকবে, অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতিতেও এই ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এই ধরনের আক্রমণে সম্ভবত বিমানবাহিনী হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা এই ধারণা পোষণ করছি যে, আক্রমণটা করবে কোন বড় বিদেশী শক্তি বা কোন ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী। তাদের সাহায্যে খোলাগুলিভাবে বা গোপনে থাকবে এই বৃহৎ শক্তি। জাতীয় বিমানবাহিনী হয় পুরোপুরি বা প্রায় পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, যোগাযোগরক্ষাকারী, বিশেষ করে হেলিকপ্টার জাতীয় কিছু অবশিষ্ট থাকবে।

নৌবাহিনীকেও গতিশীল কৌশল নিতে হবে, ছোট ছোট লঞ্চগুলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে দ্রুতগতিতে পালাতে পারে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে শত্রু তাদের ধ্বংস করতে

সচেষ্ট হবে, কিন্তু আয়তনে ছোট হওয়ায় তারা দেখবে অপসৃয়মান একটা গতিশীল কিছু, যার ফলে তাদের লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হবে না। এইভাবে শত্রুর নৌবাহিনীকে চারিদিক থেকে আক্রমণ হতে ক্ষতি করা সম্ভব।

জনগণের এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাহিনীকে পরাজিত করা সহজ নয়, মুখোমুখি লড়াই ছাড়া। জনগণের দুটি বিশাল অংশ একতাবদ্ধ হয়, কৃষক এবং শ্রমিক। পিনার দেল রিওতে যে লুটেরা বাহিনীটি এসেছিল তাদের কব্জায় আনতে তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে কৃষকবাহিনী। নিজেদের এলাকাতে এই কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে কিন্তু প্লাটুন কম্যান্ডার এবং উর্ধ্বতন অফিসারদের প্রশিক্ষণ হবে বরাবরের মত সামরিক ঘাঁটিতে। সেখান থেকে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে অধুনা যে ৩০টি ভৌগলিক অঞ্চলে দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে সেই কৃষি উন্নয়ন অঞ্চলে। আরও ত্রিশটি কৃষক সংগ্রাম অঞ্চল অতঃপর তৈরি হবে। তাদের কাজ হবে শেষ বিন্দু পর্যন্ত তাদের জমি রক্ষা করা, তাদের সমস্ত অর্জিত সামাজিক অধিকার, তাদের নতুন বাড়িগুলি, তাদের সেচের খাল, বাঁধ, তাদের জমির ফসল, স্বাধীনতা, এককথায় তাদের বেঁচে থাকার অধিকার।

শুরুতে তারা শত্রুর অগ্রগমনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, কিন্তু যদি শত্রুরা তাদের চাইতে অনেক শক্তিশালী হয়, তাহলে রণে ভঙ্গ দিয়ে গ্রামে ফিরে এসে শান্তিপূর্ণ নিরীহ কৃষকের মত জমি চাষ করবে, রাত্রে হয়ে উঠবে শত্রুর ত্রাসসৃষ্টিকারী গেরিলা যোদ্ধা। একইরকম ঘটবে শ্রমিকদের মধ্যেও। তাদের মধ্যে যারা দক্ষ, তারা সহযোগীদের নেতা হয়ে তাদের প্রতিরক্ষার মৌলিক নীতিগুলি শেখাবে। প্রত্যেক সামাজিক শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব থাকবে। কৃষক গেরিলাযোদ্ধার মত বিশেষ ধরনের লড়াইয়ে পারদর্শী হবে। দারুণ লক্ষ্যভেদ করবে, অঞ্চলের প্রতিকূলতার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করে এবং নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যাবে সে। অন্যদিকে, শ্রমিকদের সুবিধা আছে আধুনিক শহরে কাজ করার যা কিনা এক বড় এবং কার্যকরী দুর্গ ; তাদের অসুবিধার দিকটা হল গতিশীলতার অভাব। শ্রমিকদের শিখতে হবে কি করে যে কোন গাড়ি, আসবাবপত্র বা এমনকি বাসনপত্র দিয়েও রাস্তাগুলিকে ব্যারিকেড করা যায়, যাতে সমস্ত ব্লকটাকে একটা দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলা যায় ; দেওয়ালে ছিদ্র করে যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখতে হবে পরস্পরের সঙ্গে, কি করে সেই ভয়ংকর অস্ত্র "মলোটভ ককটেল" ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে অসংখ্য বাড়িগুলির গোপন জায়গা থেকে শত্রুর উপর গুলিবর্ষণ করতে হবে একই সময়ে।

শ্রমিকদের সাহায্য করবে জাতীয় পুলিশবাহিনী এবং নগর প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা বাহিনী, এইভাবেই একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। গ্রামে লড়াইয়ের মত অতটা সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে না শহরের লড়াইয়ে। অনেকের জীবন যাবে, নেতাসহ। শত্রুরা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করবে, কিন্তু শত্রুর দুর্বলতা আঁচ করতে পারলে এবং ভয়-ভীতি তাড়াতে পারলে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করাও সম্ভব, কিন্তু তার আগে ট্যাঙ্কের বলি হবে অনেকে।

শ্রমিক এবং কৃষকদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক সহযোগী শ্রেণীও যুক্ত হবে : প্রথম, ছাত্রসমাজ, বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্বে থাকবে তাদের সেরা ছাত্রদের এক বিরাট অংশ সাধারণভাবে যুব সংগঠনগুলি, তারাও একইভাবে অংশগ্রহণ করবে ; মহিলা সংগঠনগুলি

তাদের উপস্থিতি দিয়ে পুরুষদের উৎসাহিত করবে এবং লড়াইয়ের সহকারী অনেক কাজ, যেমন, রান্না করা, আহতদের সেবা করা, মৃত্যু পথযাত্রীদের একটু সান্ত্বনা দেওয়া, জামাকাপড় কাচা, এককথায় সহযোগী সমস্ত যোদ্ধাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, বিপ্লবের কঠিনতম সময়েও তারা তাদের পাশে আছে সবসময়। এ সমস্ত কিছুই অর্জিত হবে যদি সর্বব্যাপী সংগঠন গড়ে তোলা যায় সঠিক শিক্ষাদানের দ্বারা, শিক্ষা শুরু হয় নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে, বিপ্লব সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য এবং সত্য ব্যাখ্যার প্রতি অবশ্যই আলোকপাত করতে হবে।

যে কোন সভায়, যে কোন জমায়েতে যেখানে বিপ্লবী নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবে, বিপ্লবী আইনগুলো অতি অবশ্যই আলোচনা করতে হবে, ব্যাখ্যাও করতে হবে। এ ছাড়াও, নেতাদের বক্তৃতা, বিশেষ করে অবিতর্কিত নেতার, প্রতিনিয়ত পড়তে হবে, আলোচনা করে মন্তব্যও জানাতে হবে। গ্রামেগঞ্জে জনসাধারণ একত্রে রেডিও শুনবে এবং যেখানে উন্নত ব্যবস্থা আছে সেখানে যদি টেলিভিশন থাকে, তা দেখতে হবে কেননা সেখানে জনসাধারণের শিক্ষা গ্রহণ করার আছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা থেকে (ফিদেল কাস্ত্রো)।

রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ চলতেই থাকবে কেননা তাদের আশা-আকাঙ্খাই আইনে, ডিগ্রীতে, প্রস্তাবে রূপান্তরিত হয়। বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে কোন বিরুদ্ধতার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে ; বিপ্লবী জনগণের মধ্যে নৈতিকতার দিকটিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এমনকি প্রতিবিপ্লবী অংশের থেকেও আরও কড়াভাবে, যাতে বিপ্লব কখনই সুবিধাবাদের বিপজ্জনক পথে পা না বাড়ায়, তার জন্য যে কোন স্তরের বিপ্লবীর গুরুতর শৃঙ্খলাহীনতা বা নৈতিকতা বিরোধী কাজকর্ম কখনো বরদাস্ত করা হবে না, কারণ সে একজন বিপ্লবী। তার অতীতের কার্যাবলী অবশ্যই শাস্তিদানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। কিন্তু যে অপরাধ সে করেছে তার যথোপযুক্ত শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

কাজের মর্যাদা, বিশেষ করে সমষ্টিগত ক্ষেত্রে এবং সমষ্টিগত উদ্দেশ্যে করা কাজকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে রাস্তা, সেতু, বন্দর, ডক এবং স্কুল তৈরির জন্য—যে কাজ জনগণের মধ্যে এক উৎসাহের সঞ্চার করবে, যা তাদের মধ্যে এক ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করবে এবং বিপ্লবের প্রতি ভালবাসা আরও গাঢ় হবে।

এইভাবে জনগণের সঙ্গে যুক্ত হবে সশস্ত্র বাহিনী, একাত্মবোধ করবে শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে, যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের শিকড়। তারা যুদ্ধের বিশেষ কারিগরী যে সম্পর্কে অবহিত হবে, মানসিকভাবে তৈরি থাকবে যে কোন খারাপ পরিস্থিতির জন্য, নিজেদের ভাববে অপরাজেয়। আরও অপ্রতিরোধ্য হবে এই সৈন্যবাহিনী যখন নাগরিকবৃন্দ মূর্ত করবে অমর কামিলোর সেই বিখ্যাত উক্তি "বিপ্লবীবাহিনী হল সামরিক পোষাকে সজ্জিত জনগণ"। এই জন্য, এইসব কারণে, আমরা জানি, যতই কেন না একচেটিয়া পুঁজিবাদ কিউবার "খারাপ দৃষ্টান্ত" উপড়াতে চেষ্টা করুক, আমরা হেঁটে যাব এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সরণী বেয়ে।

পৃথিবীর ইতিহাসে গেরিলা যুদ্ধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমভাবে হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। গেরিলা যুদ্ধে বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এশিয়া মহাদেশে চীন, ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া, অন্যদিকে লাতিন আমেরিকায় কিউবা। তিন বছরের গেরিলা যুদ্ধে কিউবা-বিজয় সম্ভব হয়েছিল একমাত্র গেরিলাদের নীতি, কৌশল, জনসংযোগ এবং দুঃসাহসিক লড়াই ও আত্ম-বলিদানে। কিংবদন্তী বিপ্লবী চে গেভারা-র এই গ্রন্থ সেই বিজয়ী যুদ্ধের প্রধান ভিত্তি।



চে ও কামিলো : দুই গেরিলা যোদ্ধা

ISBN 978-81-85459-48-7

RADICAL IMPRESSION